১২০
200/3
BENGAL LIBRARY 28 JUN 1906

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

১ম ভাগ। } মাঘ, ১৩১২। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কামনা।

প্রতিদিন তোর কথা
স্মরি যেন অনিবার,
প্রতিদিন তোর তরে
কাঁদি যেন, মা আমার।

যেন সদা মনোমাঝে
তোর ও মূরতি রাজে,
তোর বাণী প্রাণে মোর
ঢালে যেন সুধাধার।
প্রতিদিন তোর কথা
স্মরি যেন, মা আমার।

প্রতিদিন হে জননি,
গাই যেন তোরি গান,
যত আশা, সাধ, যেন
তোরি পায়ে করি দান।
তোর স্নেহাশীষ যদি
থাকে মোর নিরবধি,
নীরবে বহিব শিরে
নিতি নব দুখ ভার।
প্রতিদিন তোর কথা
স্মরি যেন মা আমার।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

ক্যাথেরিন টেইট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

লোকসেবাই ক্যাথেরিনের ধ্যান জ্ঞান হইয়া উঠিল। পরদুঃখের কথা যাঁহারা ভাবেন তাঁহাদের এমনই হয়। লোকের দুঃখ অনুভব করিয়াই রাজপুত্র বুদ্ধ সকল রাজ-সম্পদ পায়ে ঠেলিয়াছিলেন। প্রেমিক যীশু এই দুঃখ দেখিয়াই চির জীবন দুঃখীর ন্যায় দিন কাটাইয়া গিয়াছেন।

লোকে তাঁহার নাম দিয়াছিল—Man of Sorrows—বিষাদের মূর্ত্তি। আপনাকে লইয়াই যাহারা বিব্রত থাকে, জগতের বিষাদের করুণ-সঙ্গীত তাহাদের বধির কর্ণে কিছুতেই প্রবেশ করে না। সংসারের শোক দুঃখ ও ক্রন্দন-কোলাহলের উপরেই তাহারা আপনাদের আরাম-শয্যা বিস্তার করে। ক্যাথেরিন এই ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। যতই তিনি গরিব দুঃখীর সংস্পর্শে আসিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের দুঃখ ও তাহার প্রতীকার চিন্তা প্রাণে লইয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিতেন ও আকুল হৃদয়ে সেবাব্রতে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। স্বপ্নেও বুঝি ঐ সকল কথাই ভাবিতেন। একদা গভীর নিশীথে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি স্বামীকে জাগাইয়া বলিলেন 'আমি গরিব সেবার জন্য একটী মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তুমি আমাকে সাহায্য কর।' বলা বাহুল্য ধর্ম্মপ্রাণ ডাক্তার টেইট তাঁহাকে উৎসাহ দিতে ক্রটী করিলেন না। অচিরে মহিলা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক সদাশয় মহিলার অন্তরেই গরিব দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি বিদ্যমান ছিল, ক্যাথেরিনের চেষ্টায় ও দৃষ্টান্তে সেই সহানুভূতি সবল হইল। অনেকের মনে কাজ করিবার ইচ্ছা ছিল, শক্তি ছিল, কিন্তু তাঁহারা সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার, সেই শক্তি ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইতেছিলেন না। এই মহিলা-সমিতি সকলের শক্তির সদ্ব্যবহারের উপায় করিয়া দিল। (১) সমিতির মহিলাগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য প্রত্যেককে নির্দ্দিষ্ট ব্রত গ্রহণ করিতে হইল। (২) দরিদ্র, পীড়িত ও অসহায় ব্যক্তিদিগের অভাব মোচন ও তাহাদিগের উন্নতি সাধনের জন্য সমিতির সকল মহিলা সচেষ্ট হইলেন। (৩) দান ও সৎকার্য্যে মহিলাগণের শক্তিকে সম্মিলিত করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এই সমিতির মহিলাগণ হাঁসপাতাল ও দরিদ্র-নিবাস পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সমিতির কার্য্যে অর্থ-সাহায্যের জন্য নারীসাধারণের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। সকলেই আগ্রহের সহিত ইঁহাদিগকে সাহায্য করিলেন। লণ্ডন নগরে বহুসংখ্যক দুঃখী ইতর লোকের বাস। অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের মহিলাগণ এই সমিতির সহিত যুক্ত হইয়া হাঁসপাতাল, দরিদ্র-নিবাস ও এই সকল ইতরপ্রকৃতি লোকের কদর্য্য আবাস পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। মিষ্ট ব্যবহার, সৎপরামর্শ ও অর্থসাহায্য দ্বারা ইঁহারা এই সকল লোককে সাহায্য করিতেন। সপ্তাহে একদিন করিয়া এই সেবাব্রত-ধারিণী মহিলাগণ ক্যাথেরিনের গৃহে সম্মিলিত হইতেন, সকলে মিলিত হইয়া ভগবানের চরণে শক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন। কোন্ স্থানে কিরূপ কার্য্য চলিতেছে, ক্যাথেরিন নিজে তাহা দেখিতেন ও মহিলাগণকে আবশ্যকীয় পরামর্শ দিতেন। তরুণ বয়স হইতেই নিজ কন্যাদিগকে এই সকল কার্য্যে অনুরাগিনী করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে একটী বয়স্কা মহিলার সহকারীরূপে একটী হাঁসপাতাল পরিদর্শন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে ভয়ানক ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। সেই মহামারীতে লোকে নিজের প্রাণ লইয়া ব্যস্ত, কে কাহাকে দেখে? ক্যাথেরিন স্বামীকে লইয়া সেই দুর্দ্দিনে স্বর্গের দেবীর মত পীড়িতদিগের বাড়ী বাড়ী ফিরিতেন; তাহাদিগকে ক্ষুধায় পথ্য দিতেন, যাতনায় শুশ্রূষা করিতেন ও মুমূর্ষু কালে ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। অনাথ বালকবালিকা রাখিয়া অনেক পিতা মাতা প্রাণত্যাগ করিল। বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাদের প্রতি-পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ক্যাথেরিন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় গ্ল্যাডষ্টোন সাহেবের পত্নী বালকদিগের ভার লইলেন, ক্যাথেরিন প্রায় ৩০টী বালিকার ভার গ্রহণ করিলেন। এই বালিকানিবাস এখন অনাথাশ্রমে পরিণত হইয়াছে। তিনি এই বালিকা-গণকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, ইহাদিগকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন ও গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইহারা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিয়াছিল তখনও ক্যাথেরিন ও তাঁহার কন্যার সহিত ইহাদের চিঠি পত্র চলিত। ক্যাথেরিনের

নিকট ইহারা আজীবন আপন মাতার ন্যায় ব্যবহার পাইয়াছে।

ডাক্তার টেইটের পদোন্নতি হইল। তিনি ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাজকের পদ লাভ করিলেন। কেণ্টারবারীর আর্কবিসপ পদে উন্নীত হইয়া তিনি ল্যাম্বেথ্ নামক স্থানে গমন করিলেন। সেখানেও ক্যাথেরিন পূর্ব্বের ন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন। এই সময়ের কথা তাঁহার স্বামী এইরূপ লিখিয়াছেন,—"তিনি সর্ব্বদাই আত্মগোপনেচ্ছু ছিলেন, প্রসন্নমনে লোকসেবায় নিরত থাকিতেন, কিন্তু বাহিরে কোন আড়ম্বর দেখাইতেন না। যত্ন ও শ্রম সহকারে আপনার গার্হস্থ ধর্ম্ম পালন করিতেন। যাহা গর্হিত, আন্তরিক ঘৃণার সহিত তাহার ত্রিসীমা হইতে দূরে থাকিতেন। যাহা ভাল সকল অসুবিধার মধ্যেও তাহা সযত্নে ধরিয়া থাকিতেন। কোমল প্রেমের সঙ্গে সকলের সেবা করিতেন। নিজের সুখ সুবিধার চিন্তা পশ্চাতে রাখিয়া অপরের সুখবিধানে মনোযোগী হইতেন। আশা ও উৎসাহের সহিত ভগবানের সেবা করিতেন। সকল শোক দুঃখে শান্ত ও ধীরভাব রক্ষা করিতেন। বিলাসের প্রতি সর্ব্বদা বিতৃষ্ণ ছিলেন, গরিবের প্রতি গভীর সহানুভূতি ছিল, সম্পদে বিপদে তাঁহার সহানুভূতির জন্য সকলে লালায়িত হইত। তাঁহার ব্যবহার শিশুর ন্যায় সরল ছিল।"

প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনী যেমন উভয় কুল উর্ব্বরা করিয়া সমুদ্রসঙ্গমে ধাবিত হয়, পুণ্যশীলা ক্যাথেরিনের জীবনধারাও তেমনি শত শত গরিব দুঃখীর দুঃখ মোচন, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা ও পাপীতাপীর প্রাণে আশার আলোক বিকীর্ণ করিয়া ইহজীবনের শেষ দিনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিভিন্ন অবস্থায় কত লোক এই ধর্ম্মপ্রাণ নারীর নিকট বললাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একটী মহিলা লিখিয়াছেন—"এক সময় শোকাহত হইয়া আমি মিসেস্ টেইটের নিকট বিদায় ও পরামর্শ লইতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া উপাসনায় বসিলেন। সেই স্বর্গীয় ঘটনার কথা এ জীবনে ভুলিতে পারিব না, যখনই জীবনে বিধাতার কোন বিশেষ করুণা সম্ভোগ করি, তখনই মনে হয়, ইহা বুঝি সেই দেবকন্যার সেই হৃদয়স্পর্শী সরল প্রার্থনার ফল।" আর এক জন লিখিয়াছেন, "আমি মিসেস্ টেইটের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলাম, তথাপি একবার মানসিক দুরবস্থার সময় তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম। বহু বৎসর পরেও এখন আমি তাঁহার সহজ সরল সুন্দর ব্যবহার ও প্রাণস্পর্শী উপদেশের কথা ভুলিতে পারিতেছি না। সেই গভীর দুঃখে তাঁহার সংসর্গে আমার হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল।" হাসপাতালের একটী রোগী লিখিয়া গিয়াছে—"বাইবেলের একটী বিশেষ অংশ মিসেস্ টেইট আমার রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া ভক্তিভাবে আমাকে শোনাইতেন। এখনও সেই অংশ যখনই পড়ি বা শুনি, তখনই তাঁহার ভক্তিবিগলিত সুমধুর স্বর আমার কাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠে।" কত লোক কত সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই।

ক্রমে তাঁহার জীবনযাত্রার পথ স্বল্পতর হইয়া আসিল। জীবনের সন্ধ্যাকালে তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র তাঁহার গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছিল। তাঁহার কন্যাত্রয়ও মাতার ন্যায় আত্মহারা হইয়া পরসেবা করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের দয়া ও সহানুভূতি বিধাতার আশীর্ব্বাদরূপে কত গৃহে শান্তি সুখ বর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু পুত্রটী ক্যাথেরিনের জীবনে আশা ও আনন্দের উৎসস্বরূপ হইয়াছিল। ধার্ম্মিক পিতামাতার জীবন ও শিক্ষা এই পুত্রটীকে অতি সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনিও ঈশ্বরের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান ইঁহাকেও ডাকিয়া লইলেন। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি পিতামাতা ও আপনার কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

এই শোকও ক্যাথেরিন নীরবে সহিলেন। কিন্তু প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত পাইলেন তাহাতে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। উনষষ্টি বৎসর বয়সে ক্যাথেরিনের জীবনকুসুম ঝরিয়া পড়িল। "তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ"—'তরুলতাও জীবন ধারণ করে,

পশুপক্ষীও জীবন ধারণ করে,'—সংসারে বাঁচিয়া থাকাই জীবন নহে, এই প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠ, সেবাময় জীবন যাপন করাই প্রকৃত জীবন।

পুরাণ প্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাশীরাম দাস যুধিষ্ঠিরকে কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন সে বিষয়ের দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মূল মহাভারতের যুধিষ্ঠির সকল গুণে ভূষিত, আমাদের দেশে তিনি ধর্ম্মপুত্র বলিয়া পরিচিত। যুধিষ্ঠিরের দোষের মধ্যে তিনি অত্যন্ত দ্যূতপ্রিয় ও শান্তিপ্রিয়, কিন্তু তাই বলিয়া ভীরু নহেন। কিন্তু কাশীরাম দাসের যুধিষ্ঠিরকে স্থানে স্থানে নিতান্ত গো-বেচারী বলিয়া মনে হয়।

প্রথম দৃষ্টান্ত—বনপর্ব্বের শেষভাগে বর্ণিত মায়া সরোবরের বিবরণ। মূল মহাভারতের কথা এইরূপ ;—জয়দ্রথ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী হরণের পর পাণ্ডবেরা পুনরায় দ্বৈতবনে উপনীত হইলেন। অনেকগুলি ব্রাহ্মণ সেখানে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার আর অতি অল্পই বাকী আছে। এমন সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আমার অরণী সহিত মন্থনদণ্ড একটি বৃক্ষশাখায় বাঁধা ছিল। এক মৃগ সেই বৃক্ষে গাত্র ঘর্ষণ করাতে সেই অরণী সহিত মন্থনদণ্ড বৃক্ষের শাখাচ্যুত হইয়া সেই মৃগের শিংএ জড়াইয়া গিয়াছে। সেই মৃগও আমার অরণী সহিত মন্থনদণ্ড লইয়া ঐ দেখুন পলাইয়া গিয়াছে। আপনারা শীঘ্র আমার অরণী সহিত মন্থনদণ্ড আনিয়া দিউন। দেখিবেন আমার যেন অগ্নিহোত্র বিলুপ্ত না হয়।" ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া তাঁহার অগ্নিহোত্র বিলুপ্ত হইবার ভয়ে যুধিষ্ঠির অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অমনি পঞ্চ ভ্রাতায় ধনুঃশর লইয়া মৃগের অনুশরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃগটিকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিলেন না। অনেক দূর গিয়া মৃগটিকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন পঞ্চ ভ্রাতায় ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এক বিশাল বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। তখন ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব, যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নকুলকে বলিলেন, "তোমরা সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, অতএব এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখ নিকটে জলাশয় আছে কি না।" নকুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বলিলেন যে, কিছুদূরে এক জলাশয় আছে। তখন যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র গিয়া সেই জলাশয় হইতে তূনীর পূর্ণ জল লইয়া আইস।" নকুল জল আনিতে চলিলেন; কিন্তু যক্ষের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জল পান করায় মরিয়া গেলেন। নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে পাঠাইলেন। সহদেব ও নকুলের দশা প্রাপ্ত হইলেন। তার পর অর্জ্জুনকে জল আনিতে পাঠান হইল। অর্জ্জুনও নকুল সহদেবের দশা প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে ভীমকে পাঠান হইল। ভীমেরও সেই দশা ঘটিল। যখন ভীমও ফিরিয়া আসিলেন না তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির চিন্তিত মনে নিজেই জল ও ভ্রাতাদিগের অন্বেষণে বাহির হইলেন। যুধিষ্ঠির সেই মায়া সরোবরে উপস্থিত হইয়া চারি ভ্রাতার প্রাণশূন্য দেহ দেখিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইলেন এবং তাঁহাদের সেই অবস্থা প্রাপ্তির কারণ নির্দ্দেশে যত্নপর হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, "এই সকল মহাবীরগণকে যে কেহ হত্যা করিয়াছে এমন বোধ হয় না, যেহেতু ইহাদের কাহারও অঙ্গে আঘাতের চিহ্নমাত্র নাই। বোধ হয় দুরাত্মা দুর্য্যোধন এই সরোবরের জল বিষাক্ত করিয়া দিয়া গিয়াছে, সেই বিষাক্ত জল পানে আমার ভ্রাতারা প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" এইরূপ চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। অমনি অন্তরীক্ষ হইতে যক্ষ বলিল, "রাজপুত্র, আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, তোমার অনুজগণকে আমিই শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছি। তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও তাহা হইলে তোমাকেও ইহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়, এরূপ সাহস

করিও না, আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি, অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও।" রাজা যুধিষ্ঠির বলিলেন, "হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই পর্ব্বত চতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা তো পক্ষীর কর্ম্ম নয়! বোধ হয় এই মহৎ কার্য্য আপনি করিয়াছেন। আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুৎগণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না, আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিয়াছেন? ভগবান্, আপনি কে, কি করিবেন, আপনার অভিলাষ কি কিছুই জানি না। অধুনা উহা জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আপনি কে?" তখন যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "আমি যক্ষ, আমিই তোমার ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।" তার পর যুধিষ্ঠির যক্ষের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিলেন। যক্ষ প্রীত হইয়া ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবকে বাঁচাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং ধর্ম্ম যে যুধিষ্ঠিরকে পরীক্ষা করিবার জন্য এই মায়া সরোবর সৃষ্টি করিয়াছিলেন ও যক্ষরূপ ধরিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন। এই প্রসঙ্গে দ্রৌপদীর উল্লেখ মাত্র নাই এবং যুধিষ্ঠির স্বীয় দুরবস্থার কথা বলিয়া যক্ষের নিকট ক্রন্দনও করিতেছেন না। এই বিষয়ে কাশীদাস কি বলেন দেখুন।

সান্দীপন মুনির আশ্রম হইতে পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীসহ পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তাঁহারা এক বৃক্ষতলে বসিলেন। "বৃক্ষ মূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে, জল আছে কোথা ভীম আনহ সত্বরে।" ভীম জল আনিতে চলিলেন। সেই মায়া সরোবরে গিয়া মরিয়া রহিলেন। ভীমের পর একে একে অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব জল আনিতে গেলেন ও ভীমের দশা প্রাপ্ত হইলেন। চারি ভ্রাতার কেহই যখন ফিরিলেন না, যুধিষ্ঠির ভয়ানক চিন্তাযুক্ত হইয়া "কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি :—

শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী—
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি।
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী—
বারিপাত্র লয়ে যায় আনিবারে বারি।
মহাঘোর বন মধ্যে প্রবেশিয়া সতী
ভয় পায়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী।"

দ্রৌপদীও যখন ফিরিলেন না, তখন যুধিষ্ঠির স্বয়ং বাহির হইলেন। মায়া সরোবর প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অবস্থা দেখিয়া অনেক কাঁদিলেন। অবশেষে সেই সরোবরে ডুবিয়া মরিতে গেলেন। তখন বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার কথা না শুনিয়া তোমার চার ভাই ও দ্রৌপদী মরিয়াছে। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া জলপান কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন আমার মত দুঃখী নাই, আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, আমি মরিব। এই বলিয়া বকের নিকট দুঃখের তালিকা দিতে আরম্ভ করিলেন। বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইয়া আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির বকের জিজ্ঞাসিত চারিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। এবং নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়া ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব ও দ্রৌপদীকে বাঁচাইয়া দিলেন। কাশীরাম দাসের যুধিষ্ঠির এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য যে পত্নী দ্রৌপদীকে বিপদ-সংকুল বনমধ্যে শ্রীহরি স্মরণ করিয়া জল আনিবার জন্য পাঠাইলেন, তথাপি নিজে নড়িতে চাহিলেন না। কাশীদাসী মহাভারতের এই অংশ পাঠ করিয়া এক বর্ষীয়সী বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে "যুধিষ্ঠিরের মত এমন মেয়েমুখো লোক তো আর দেখা যায় না। আরে বাপু, নিজে না গিয়ে না হয় ছোট ভাইদেরই জল আন্‌তে পাঠালি, শেষে কি না বৌটাকে শুদ্ধো নিবিড় বনে একলা জল আন্‌তে পাঠাইতে কি তোর একটু লজ্জাও হ'ল না?"

কাশীরামের হস্তে যুধিষ্ঠিরের দুর্দ্দশার আর একটু পরিচয় লউন। এবার মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বের বিষয়।

যুধিষ্ঠির অভিমন্যুনন্দন পরীক্ষিতকে হস্তিনার রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব ও দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থান করিলেন। একটি কুকুরও তাঁহাদের সঙ্গে

চলিল। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী সহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ দ্রৌপদীর সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তর পথে চলিতে চলিতে হিমালয় পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিবার মানসে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় দ্রৌপদী নিতান্ত পরিশ্রম নিবন্ধন যোগভ্রষ্ট হইয়া যুধিষ্ঠিরাদির সম্মুখেই ভূতলে নিপতিত হইলেন। যুধিষ্ঠির ভীমের জিজ্ঞাসামত দ্রৌপদীর অসাময়িক মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া আর দ্রৌপদীর প্রতি নেত্রপাত না করিয়াই সমাহিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেবও ধরাতলে পতিত হইলেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের প্রতি আর দৃষ্টিপাত না করিয়া সমাহিত চিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, পত্নী ও ভ্রাতাগণের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিলেন না। সর্ব্বস্বত্যাগী যোগপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ আচরণই অতি স্বাভাবিক। ইহা মূল মহাভারতের বিবরণ। এস্থলে কাশীদাসী মহাভারতে কি আছে এখন তাহাই দেখুন।

দ্রৌপদী ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অগ্রগামী যুধিষ্ঠির প্রথমে তাহা জানিতে পারিলেন না। ভীম যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া সে কথা জানাইলেন, শুনিয়া যুধিষ্ঠির শোকে আকুল হইলেন। দ্রৌপদীর মৃতদেহ কোলে লইয়া ভ্রাতৃগণসহ এক পৃষ্ঠাব্যাপী ক্রন্দন করিতে বসিয়া গেলেন। যথা,

যুধিষ্ঠির নৃপমণি কোলে লইয়া যাজ্ঞসেনী
কান্দিছেন সকরুণ ভাষে।
শোক দুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন
অশ্রু মুখে বৈসে চারি পাশে।
দ্রৌপদীর মুখ চেয়ে, কান্দে সবে বিলাপিয়ে
কোথা গেলে দ্রুপদ নন্দিনী ;
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচক বীরে
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি। ইত্যাদি।

সহদেব নকুল, অর্জ্জুন ও ভীম ইহাদের প্রত্যেকের ধরাতলে পতনের পর পূর্ব্বের ন্যায় পৃষ্ঠাব্যাপী কান্নাকাটি। পুত্রের বিয়োগ হইলে জননী যেমন পুত্রের গুণ স্মরণ করিয়া কাঁদেন, এ যেন তার চেয়েও বেশী। পৃথিবীত্যাগী যোগপরায়ণ ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত কাজই তো এই! ভারতচন্দ্রের রতিই কেবল 'পতি শোকে, নানা ছাঁদে বিনাইয়া' কাঁদেন, তা নয়, বঙ্গীয় কবিগণের হস্তে পড়িয়া রাম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহাবীর ও আদর্শ পুরুষগণ এ বিষয়ে রতি ঠাকুরাণীকেও হারাইয়া দিয়াছেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

জাপানে পাশ্চাত্য জাতি।

ওলন্দাজ অভ্যুদয়।

পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডে পোপের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। মার্টিন লুথারের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তিনি খৃষ্টান রাজ্যে সর্ব্বত্রই যীশুর অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। তাঁহার নিকট ছাড়পত্র পাইলে পাপীগণ আপনাদিগকে পাপমুক্ত মনে করিত, তাঁহার অনুমোদনে নরনারীর জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইত, তাঁহার বক্র দৃষ্টি মানুষকে বিভীষিকাময় নরকে নিক্ষেপ করিত। এই অমানুষিক শক্তিশালী পোপের চরণতলে ইউরোপের রাজচক্রবর্ত্তীগণের রাজমুকুট লুণ্ঠিত হইত, তাঁহার অনুমোদন লইয়া রাজাগণ সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইত।

রোমান ক্যাথলিক স্পেন ও পর্ত্তুগাল দেশবাসীগণ ষোড়শ শতাব্দীতে পৃথিবীর পশ্চিম ও পূর্ব্বখণ্ডে বাণিজ্য করিতে পোপের অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। পোপ তাহাদিগকে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, অন্য কাহাকেও দেন নাই, সুতরাং তাহারা মনে করিত, পৃথিবীর অপর কাহারও উক্ত প্রদেশ সমূহে বাণিজ্য করিবার অধিকার নাই। আর যে কেহ সেই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে যাইত তাহারাই স্পেনীয় ও পর্ত্তুগিজগণ কর্ত্তৃক সমুদ্র-তস্কর নামে অভি-

হিত হইত ও তাহাদের হস্তে নানা প্রকারে লাঞ্ছিত হইত।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ও হলণ্ড দেশবাসীগণ প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মানুরাগী হইয়া পোপের পার্থিব, অপার্থিব সকল শক্তিই অস্বীকার করিয়াছিল। পোপের ভয় পরিত্যাগ করিয়া তাহারা ইচ্ছামত যথা তথা বাণিজ্য করিতে লাগিল। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ উইলিয়ম আডামসের কর্ত্তৃত্বাধীনে জাপানে পাঁচ খানা জাহাজ প্রেরণ করিল। দৈব দুর্য্যোগে আডামসের তিন খানা জাহাজ বিনষ্ট হইল, পর্ত্তুগিজগণ পথিমধ্যে একখানা লুঠিয়া লইল। একখানা মাত্র জাহাজ জাপানের কিউসিউ দ্বীপে উপস্থিত হইল। বুঙ্গোনগরের শাসনকর্ত্তা আডামসকে সদয় ভাবেই গ্রহণ করিলেন; কিন্তু পর্ত্তুগিজগণের চক্রান্তে রাজ্য আক্রমণকারী বলিয়া আডামস্ ও তাঁহার সঙ্গীগণ কারারুদ্ধ হইলেন ও এক চল্লিশ দিবস কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিয়া সম্রাটের বিচারে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইলেন।

আডামস্ অতি তীক্ষবুদ্ধি লোক ছিলেন। তাঁহার সদ্ব্যবহারে ও বুদ্ধি কৌশলে ওলন্দাজগণ জাপানে পরম সমাদর লাভ করিল। কিছু দিন পরে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুমতি চাহিলে সম্রাট তাহাদিগকে আরো দুই বৎসর কাল জাপানে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। আডামস্ রাজানুগ্রহে প্রভূত ক্ষমতা লাভ করিলেন। পর্ত্তুগিজগণকেও এখন তাঁহার কৃপাভিখারী হইতে হইল; কারণ তাঁহার সাহায্য ব্যতীত রাজানুগ্রহ লাভের আর উপায়ান্তর ছিল না। সম্রাটের ব্যবহারের জন্য আডামস্ ওলন্দাজগণের দ্বারা দুই খানি জাহাজ প্রস্তুত করাইলেন; জাপানের বর্ত্তমান দুর্জ্জেয় রণপোত বহরের ইহাই ভিত্তি-পত্তন।

১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে আর দুই খানি ওলন্দাজ বাণিজ্য পোত জাপানে উপস্থিত হইল। আডামসের সাহায্যে তাহারা জাপানে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিল। এইরূপ জাপানে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যের আরম্ভ হইল। আডামস্ দীর্ঘকাল জাপানে বাস করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে দেখিবার জন্য তিনি একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এখন স্বদেশীয় জাহাজ দেখিয়া সম্রাটের নিকট স্বদেশ গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলেন না। স্বদেশ হইতে স্ত্রীপুত্রকে জাপানে আনাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। আডামস্ তদনুসারে স্বদেশে পত্রও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পত্র তাঁহার পত্নী ও বন্ধুগণের হস্তগত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বিংশতি বৎসর জাপানে বাস করিয়া ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে আডামসের মৃত্যু হয়। আডামসের নিকট জাপানীগণ নানা বিষয়ে ঋণী। বলিতে গেলে ইনিই জাপানের বর্ত্তমান সভ্যতা ও উন্নতির মূল কারণ। ইনিই সর্ব্বপ্রথম জাপানীদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাহাজ নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষতা লাভের উপায় দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগিজগণ জাপানে পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রটী করিত না। সম্রাটের প্রীতি সাধনের জন্য উভয় দলই বিধিমত চেষ্টা করিত। কিন্তু পর্ত্তুগিজগণের পূর্ব্বকৃত বিশ্বাসঘাতকতায় সম্রাট সকল বিদেশীয়ের প্রতিই বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাপানে বিদেশীয়গণের কষ্টের অবধি ছিল না। একজন জার্ম্মাণ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "সম্রাটের ভয়ে ওলন্দাজেরা রবিবারে প্রকাশ্য ভাবে আপনাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে পারিত না, ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিতে সাহস করিত না।" সর্ব্বপ্রকারে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করিতে জাপানীরা সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। সম্রাট সকল বিষয়ে তাহাদিগকে শাসনে রাখিতেন, আজ এক প্রকার আদেশ করিয়া কাল তাহা পরিবর্ত্তন করিতেন, সামান্য অপরাধে বা বিনা অপরাধে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দণ্ডিত করিতেন। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ওলন্দাজগণকে ডিজিমা নামক একটী ক্ষুদ্র অপকৃষ্ট স্থানে বাস করিতে আদেশ করা হইল। এই স্থানে তাহাদিগকে এক প্রকার কয়েদীর মত বাস করিতে হইত। তাহারা সেখানে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিতে পাইত না, তাহাদিগকে জাপানী ভৃত্য, জাপানী হিসাবলেখক রাখিতে হইত। প্রতি

নূতন কাজে সম্রাটের অনুমতি লইতে হইত, প্রতিদিন একজন পুলিস কর্ম্মচারী আসিয়া তাহাদের সকল বিষয়ের সন্ধান লইয়া যাইত। হলণ্ড হইতে নূতন বাণিজ্য পোত উপস্থিত হইলেই যাত্রীদিগের সম্মুখে খৃষ্টধর্ম্মের পবিত্র চিহ্ন একখানি ক্রুশ স্থাপন করা হইত এবং তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বলা হইত 'ইহা জাপানী ভূত, তোমরা ইহার উপর পদ স্থাপন কর।' খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে জাপান হইতে তাড়াইয়া দিবার ভয় দেখান হইত। কিন্তু বাণিজ্যে অর্থলাভের প্রত্যাশায় ওলন্দাজগণ সকল অত্যাচার লাঞ্ছনাই সহ্য করিত। সকল কষ্ট সহিয়াও তাহারা দুই শত বৎসর জাপানে বাণিজ্য করিয়াছিল।

ব্রহ্মাণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রাচীন ইউরোপের ব্রহ্মাণ্ড।

আমাদের দেশে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা ছিল, তৎ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। অতঃপর এ বিষয়ে ইউরোপে কিরূপে লোকের মত গঠিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাউক।

প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগের কেহ কেহ মনে করিতেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের গোলাকার খোলটী স্ফটিকের। তাহাতে অনেক পেরেক মারিয়াছে, সেইগুলিকেই আমরা নক্ষত্র বলি। কেহ কেহ আবার বলিতেন যে পানের 'ডিবের' ন্যায় দুইটী পাত্রের যোগে ঐ খোল প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু পাত্র দুইটীকে জুড়িতে পারে নাই, তাই তাহার মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া আমরা স্বর্গের আলোক একটু একটু দেখিতে পাই; আর তাহাকেই 'ছায়া পথ' বলি।

হোমারের সময়ে গ্রীকদিগের ভিতরে একটী কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল। তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে তখনকার লোকের বিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহার আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক দেবতাদিগের ভিতরে একজন কামার ছিলেন তাঁহার নাম ভালকান (Vulcan)। একদিন সেই দেবতার নেহাই, অর্থাৎ যাহার উপরে রাখিয়া তিনি লোহা পিটিতেন—ইংরাজীতে যাহাকে anvil বলে—সেই জিনিসটি স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে, এবং সেখান হইতে পাতালে পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে ১৮ দিন, ১৮ রাত্রি সময় লাগিয়াছিল। একটা ভারি জিনিসকে শূন্যে ছাড়িয়া দিলে, সে ১৮ দিন ১৮ রাত্রিতে প্রায় ৮ লক্ষ মাইল নীচে গিয়া পড়িবে। সুতরাং ঐ ঘটনা দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের এই পরিমাণ গভীরতা বুঝাইতেছে। এই গভীরতা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের প্রায় তিনগুণ।

এই সকল মতের ভিতরে আমরা প্রসিদ্ধ (Ptolemy) টলেমির মতের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাই। টলেমি তাঁহার সময়ের প্রচলিত মতসকল সংগ্রহ, সংশোধন এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া এক নূতন ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সেই মতই বহুকাল যাবৎ পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতগণের একমাত্র অবলম্বন ছিল। টলেমির মতটী এইরূপ। বাজারে এক রকম খেলানা বিক্রয় হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। তাহার আকৃতি ডিমের ন্যায়, মাঝখানে জোড় থাকে; তাহা খুলিলে, ভিতর হইতে আর একটী ডিম বাহির হয়। তাহার ভিতর হইতে আর একটী ডিম বাহির করা যায়। সেটীর ভিতরে আবার আর একটা, এইরূপ অনেকগুলি ডিম, অথবা ডিমের খোলা, ক্রমাগত একটীর ভিতর আর একটী, সেই খেলানায় সাজান থাকে। মনে মনে এইরূপ একটী খেলানার কথা ভাবুন। আর মনে করুন, যেন তাহার খোলাগুলি কাঁচ অথবা স্ফটিকের ন্যায় অতিশয় স্বচ্ছ, আর ব্রহ্মাণ্ডের খোলার ন্যায় ভয়ানক বড়। তাহা হইলেই ব্রহ্মাণ্ডের "কাঠামোটী" প্রাপ্ত হইলেন। এখন মনে করুন, ঐ সকল খোলার বাহিরেরটীতে তারাগুলি বসান রহিয়াছে। ভিতরেরগুলির কোনটাতে সূর্য্য, কোনটাতে চন্দ্র, কোনটাতে শনি, কোনটাতে বৃহস্পতি, এইরূপ। যে খেলাটীতে যে জিনিস আছে, তাহার গতির নিয়মানুসারে সেই

খোলা ঘুরিতেছে। তাহা হইলেই টলেমির মতানুযায়ী ব্রহ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, এই মত অতিশয় প্রবল ছিল। তারপর কোপার্ণিকাসের মত প্রচলিত হয়। পৃথিবী যে ঘোরে, এ কথা কোপার্ণিকাসের পূর্ব্বেও অনেকে বিশ্বাস করিতেন। আমাদের দেশেও যে এ মত ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এ বিশ্বাস কেবল পৃথিবীর আহ্নিক গতির সম্বন্ধেই ছিল। পৃথিবী এক স্থানে থাকিয়াই ঘোরে, আর তাহাতে দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন হয়, পণ্ডিতেরা এইটুকু মাত্র মনে করিতেন। কিন্তু পৃথিবী যে আবার সূর্য্যের চারিদিকেও ঘুরিয়া আসে, তাহার কথা তথনও কেহ বলেন নাই। কোপার্ণিকাস প্রথমে বলিলেন যে,

কোপার্ণিকাসের মত।

"চন্দ্র সূর্য্য গ্রহাদি যে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, একথা ঠিক নহে। সূর্য্যকে কেন্দ্রস্বরূপ রাখিয়া তাহারই চারি দিকে পৃথিবী এবং অন্য সকল গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে।"

একথা প্রথমে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। যাঁহারা ইহার প্রশংসা করিলেন, তাঁহারাও ইহা গ্রহণ করিলেন না। এমন কি, কেপ্‌লার ও টাইকোব্রাহির ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিতগণও ইহাকে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন। কেপ্‌লার বলিলেন "এত বড় বড়ি গেলা সহজ নয়" (অর্থাৎ এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করা সহজ নয়)। টাইকোব্রাহি বলিলেন, "পৃথিবী এতদূর ঘুরিয়া আসে, তবু তারাগুলি নড়ে না, তারাগুলি কি এতই দূরে? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে মাঝখানে এতটা জায়গা অনর্থক খালিই বা পড়িয়া থাকে কেন?"

টাইকোব্রাহির আপত্তি।

টাইকোব্রাহি যেমন তেমন পণ্ডিত ছিলেন না। অসার যুক্তি অবলম্বন করা তাঁহার মত লোকের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। বিষয়টী অতিশয় গুরুতর, সুতরাং তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

এক রকম খেলা আছে, তাহার কথা বোধ হয় অনেকে জানেন। যাঁহারা না জানেন, তাঁহারা অতঃপর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। একজন বুদ্ধিমান লোক, আর একজন একটু নির্ব্বোধ গোছের লোক হইলে এই খেলার সুবিধা হয়। জ্যোৎস্না রাত্রিতে যখন পরিষ্কার চাঁদ ওঠে, তখন এই খেলার সময়। বুদ্ধিমান নির্ব্বোধকে একটী প্রশস্ত খোলা জায়গায় এমন ভাবে দাঁড় করাইবেন, যেন চন্দ্র ঠিক তাহার ডাইনে কি বামে থাকে। এবং তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে বলিবেন, যে চন্দ্র ঠিক তাহার ডাইনে, কি বামে। দৃষ্টান্তস্থলে মনে করুন, যেন ডাইনে। অতঃপর তাহার চোখ বাঁধিয়া, তাহার ঠিক সম্মুখের দিকে তাহাকে দুইশত পা লইয়া যাউন; তারপর জিজ্ঞাসা করুন যে "এখন চন্দ্র কোথায়?" বুদ্ধিমান লোক যদি বাস্তবিকই বুদ্ধিমান হন তবে অবশ্য তিনি জানেন যে চন্দ্র তখনও ঠিক তাহার ডাইনেই রহিয়াছে। যদি না জানেন, তবে তিনি বুদ্ধিমান নহেন। আর নির্ব্বোধটী যদি বাস্তবিক নির্ব্বোধ হয়, তবে সেও অকপটচিত্তে পিছনের দিকে হাত বাড়াইয়া, চাঁদ দেখাইতে চেষ্টা করিবে। কারণ তাহার বিশ্বাস, যে সে এতদূর অগ্রসর হইয়া আসাতে, চন্দ্র পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। যদি নির্ব্বোধ ব্যক্তি, পিছনের দিকে চাঁদ না দেখাইয়া, যথোচিত রূপে, অর্থাৎ ঠিক ডাইনের দিকে, চাঁদকে দেখায়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, সে ব্যক্তি নির্ব্বোধ নহে।

এস্থলে দুটী বিষয় প্রণিধান যোগ্য। (১) আমরা এক স্থান হইতে কোনও জিনিসকে যে দিকে দেখিতে পাই, স্থানান্তরে গিয়া আর সে জিনিসটাকে সে দিকে দেখিতে পাই না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে করুন—আমি যদি পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াই এবং আমার সম্মুখে এক সারি পর পর বেঞ্চে অনেকগুলি লোক বসে, তবে আমি তাহাদিগের কয়েকজনকে ঠিক পূর্ব্ব দিকে দেখিতে পাইব। কিন্তু আমি একটু দক্ষিণে সরিয়া গেলে এই কয়জনকে ঠিক পূর্ব্ব দিকে দেখিতে পাইব না। ইহাদের সকলেই তখন অল্লাধিক উত্তরের দিকে দৃষ্ট হইবে। 'অল্লাধিক' এই জন্য বলিতেছি যে, পর পর বেঞ্চে বসার দরুণ, ইহারা সকলে আমা হইতে সমান দূরে অবস্থিত নহে। যাহারা অপেক্ষাকৃত কাছে, তাহাদের দিক্ পরিবর্ত্তন একটু বেশী বোধ হইবে। আবার যাহারা দূরে, তাহাদের

দিক পরিবর্ত্তন খুব কমই বোধ হইবে, এমন কি তাহা আমি ভাল করিয়া বুঝিতেই পারিব না। আমি যে দ্রষ্টা, আমার স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণ, ঐ যে দৃষ্ট বস্তু, তাহার দিকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তবেই দেখা যাইতেছে যে, দ্রষ্টার স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণতঃ, দৃষ্ট বস্তুর দিক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এই সত্যের দৃষ্টান্ত আমরা পদে পদেই পাইয়া থাকি। সুতরাং জ্ঞাতসারে হউক কি অজ্ঞাতসারে হউক, নিতান্ত নির্ব্বোধ লোকেও, এই পরিমাণ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। খেলার ঐ নির্ব্বোধ লোকটীও এই পরিমাণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। তাই সে মনে করিয়াছে যে, সে অগ্রসর হইয়া যাইবার দরুণ চাঁদ বুঝি পিছনে পড়িয়া গেল।

অতঃপর আর একটা কথা বিবেচনা করুন। আমার স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণ উপবিষ্ট সকলের দিক পরিবর্ত্তন সমান হইল না। যাহারা যতদূরে, তাহাদের দিকের ততই কম পরিবর্ত্তন হইবে। এমন কি, বেশী দূরে যাঁহারা আছে, তাহাদের দিক পরিবর্ত্তন আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, আমি দ্রষ্টা যে পরিমাণে স্থান পরিবর্ত্তন করি, আমার দৃষ্ট বস্তুর দূরত্ব যদি তাহার তুলনায় নিতান্ত বেশী হয়, তবে স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণ উহার দিকের পরিবর্ত্তন সহজে লক্ষ্য করা যায় না। এই হিসাবটা একটু সূক্ষ্ম হইল; সুতরাং ইহা আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার বিষয় হইলেও আমরা সহজে এ কথার খবর লই না। খেলার ঐ নির্ব্বোধ ব্যক্তির বিদ্যাও এতদূর পৌঁছায় নাই। তাই বেচারা নির্ব্বোধ।

এখন আর একবার টাইকোব্রাহির আপত্তির আলোচনা করা যাউক। পৃথিবী হইতে সূর্য্য সওয়া নয় কোটী মাইলেরও বেশী দূরে। সূর্য্য হইতে এত খানি দূরে থাকিয়া বৎসরে একবার পৃথিবী তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং এখন পৃথিবী যে স্থানে আছে, ছয় মাস পরে সে সেস্থান হইতে প্রায় সাড়ে আঠার কোটী মাইল দূরে সূর্য্যের অপরদিকে গিয়া উপস্থিত হইবে। এখন কথা এই,—'আজ যে তারাটাকে আমরা যেদিকে দেখিলাম, ছয় মাস পরে যখন পৃথিবী এখান হইতে সাড়ে আঠার কোটী মাইল দূরে চলিয়া যাইবে, তখন কি সেই তারাটীকে তাহা অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন দিকে দেখিব না?' কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় ত এরূপ কোনও বিভিন্নতার পরিচয় পাই না।

ইহা হইতে দুই রকম সিদ্ধান্ত হইতে পারে। এক এই যে "বিভিন্নতা হয় না, সুতরাং পৃথিবীও স্থান পরিবর্ত্তন করে না।" আর এক সিদ্ধান্ত এই যে, "পৃথিবী যে পরিমাণে স্থান পরিবর্ত্তন করে, তারাগুলি তাহার তুলনায় অত্যন্ত বেশী দূরে। সুতরাং পৃথিবীর স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণ তারার দিক পরিবর্ত্তন এত সামান্য হয় যে, সহজ উপায়ে তাহা ধরা যায় না।" টাইকোব্রাহি, প্রাচীন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, তারাগুলিকে অনেক কাছে মনে করিতেন। সুতরাং, পৃথিবীর সূর্য্যের চারিধারে পরিভ্রমণের কথা মানিয়া লইয়া, সেই সংস্কারে আঘাত দিতে তিনি প্রস্তুত হইলেন না। কুসংস্কার মানুষকে এতই অন্ধ করিয়া রাখে যে, সত্য আপনা হইতে আসিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলেও, সে তাহাকে চিনিতে পারে না।

যাহা হউক কোপার্ণিকাস এতদূর অগ্রসর হইয়াও ব্রহ্মাণ্ডের খোলাগুলির হাত এড়াইতে পারিলেন না। সেগুলির অস্তিত্ব তিনিও মানিতেন। এই খোলাগুলি বোধ হয় আমাদের পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের 'ভাণ্ডের'ই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত সংস্করণ। এ গুলিকে পাইয়া পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিতেরা যেন নিতান্তই মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। এগুলি ঘুরিবার সময় কিরূপ চমৎকার 'বন্ বন্' শব্দ হয় তাঁহারা তাহারও কল্পনা করিতে ছাড়েন নাই। Music of the spheres কথাটার উৎপত্তি ইহা হইতেই।

কোপার্ণিকাসের মত সাধারণে গৃহীত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল। পণ্ডিতেরা ক্রমে ইহার বিরুদ্ধাচরণ পরিত্যাগ করিলেও, ইহার এক নূতন শত্রু দাঁড়াইয়াছিল। সে

ধর্ম্মযাজকদিগের শত্রুতা।

সময়ের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিতরে, জগতের কেন্দ্র এবং জীবগণের বাসস্থান বলিয়া, পৃথিবীর একটা বিশেষ সম্মান ছিল। পৃথিবীর কেন্দ্রত্ব যখন ঘুচিয়া গেল, তখন অপরাপর গ্রহগণ তাহার সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং জীবের এক মাত্র আবাসভূমি বলিয়া তাহার যে বিশেষ সম্মান ছিল, তাহাও লোপ পাইবার গতিক হইল। লোকের জিজ্ঞাসা করিবার কারণ হইল যে, "এক গ্রহে যদি জীব থাকিতে পারে, তবে অন্য গ্রহে কেন পারিবে না?" সে সময়ের ধর্ম্মাচার্য্যগণ, ইহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মের বিপদ আশঙ্কা করিয়া, নিতান্তই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রুনো নামক এক ব্যক্তিকে পোড়াইয়া মারা হইল, তাহার এক কারণ এই ছিল যে,—তিনি কোপার্ণিকাসের শিষ্য। জগদ্বিখ্যাত গ্যালিলিও কোপার্ণিকাসের মতাবলম্বী ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কিরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মাণ্ড।

যাহা হউক, কোপার্ণিকাসের মতকে কেহই দূর করিয়া দিতে পারিল না। এ মত সকলেই গ্রহণ করিলেন; এবং তদবধিই জ্যোতির্ব্বিদ্যার প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত হইয়া, মানবজাতিকে ভগবানের এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্ব অনুভব করিবার অধিকারী করিল। গ্যালিলিওর সময়েই, অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীতে, দূরবীক্ষণের আবিষ্কার হইয়াছিল। সেই শতাব্দীর শেষভাগে নিউটন তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক জগদ্বিখ্যাত সূত্র সকল লিপিবদ্ধ ও প্রচার করিলেন। ইহার পরের শতাব্দীতে হার্সেল এবং লাপ্লাস জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। হার্সেল অপরূপ ক্ষমতাশালী বৃহৎ বৃহৎ দূরবীক্ষণ সকল নির্ম্মাণ করিয়া আকাশরাজ্যের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সূত্রপাত করিলেন। লাপ্লাস, গণিতের অতিশয় গভীর আলোচনা দ্বারা, কোপার্ণিকাসের মতের ও মাধ্যাকর্ষণবিধির সত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, জ্যোতিষ্কগণের গতিবিধি কেবল যে মাধ্যাকর্ষণবিধির অনুকূল, তাহা নহে;—মাধ্যাকর্ষণের নিয়মানুসারে না চলিয়া তাহাদের আর উপায়ান্তর নাই। তিনি দেখাইলেন যে, "এই সৌরজগতের গঠনপ্রণালী এবং নিয়মাবলীর ভিতরে এমন আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বর্ত্তমান রহিয়াছে যে, অকস্মাৎ ইহার কোনও আভ্যন্তরিক বিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

এই সময় হইতেই, আকাশে নক্ষত্রগণের স্থান সূক্ষ্মরূপে নিরূপণ করিবার জন্য, স্থানে স্থানে মানমন্দির (observatory) সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এবং বলিতে গেলে, বর্ত্তমান সময়ে তারাগণের গতিবিধির সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যাহা কিছু তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এই সময় হইতেই তাহার সূত্রপাত।

Spectroscope বা বর্ণবীক্ষণ যন্ত্র।

উনবিংশ শতাব্দীতে জ্যোতির্ব্বিদ্যার উন্নতির পথ দুইটী আবিষ্কার দ্বারা অতিশয় প্রশস্ত হইয়াছিল। ইহাদের একটী ফটোগ্রাফি; আর একটী বর্ণবীক্ষণ (Spectroscope)। ফটোগ্রাফির কথা সকলেই অল্পাধিক জানেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন দেখি না। কিন্তু Spectroscopeএর সম্বন্ধে দু এক কথা বলিলে হয়ত কাহারও কাহারও পক্ষে বিষয়টা বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে।

ঝাড়ের কলমে রৌদ্র পড়িয়া কেমন সুন্দর রং হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। সূর্য্যের সাদা আলোর উপকরণ গুলিকে পৃথক করিলে ঐরূপ নানা বর্ণের রঙ্গীণ আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ আলোকের বিশ্লেষণ, অর্থাৎ তাহার উপাদান গুলিকে পৃথক করাই, ঝাড়ের কলমের কাজ। spectroscope আর কিছুই নহে; ঝাড়ের কলমের আকৃতিবিশিষ্ট কাচ দ্বারা এই কাজটী সুন্দর এবং সূক্ষ্মরূপে করিবার যন্ত্র মাত্র। যে কোন প্রকারের আলোক spectroscope দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। যন্ত্রের এক দিক দিয়া আলো প্রবেশ করে, আর এক দিক দিয়া তাহা দেখিতে হয়; অথবা ইচ্ছা হইলে তাহার ফটোগ্রাফও তুলিতে পারা যায়। spectroscopeএর ভিতরে বিশ্লিষ্ট আলোককে রামধনুর

বর্ণবিশিষ্ট একটী লম্বা ফিতার আকারে দেখা যায়। অনন্ত পদার্থ এবং তাহার অবস্থা ভেদে এই ফিতার চেহারা অসংখ্যরূপ হইয়া থাকে। এবং তাহা দেখিয়া সেই জিনিস এবং তাহার অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে পারা যায়। যেমন,—জিনিসটি তরল অথবা কঠিন কি বাষ্প? বাষ্প হইলে তাহা কোন্ জিনিসের বাষ্প? বাষ্প নিজেই জ্বলিতেছে, না অন্য কোন জিনিসের আলো তাহার ভিতর দিয়া আসিতেছে? যে আলোক পরীক্ষা করা হইতেছে, তাহা নিশ্চল, না তাহা ক্রমে আমাদের নিকটবর্ত্তী অথবা দূরবর্ত্তী হইতেছে? আর তাহার বেগ কিরূপ? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ণবীক্ষণের সাক্ষ্য অতিশয় মূল্যবান। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

ম্যাক্সিম গোরকী।

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে দুই জন তরুণবয়স্ক ব্যক্তি মধ্যরুশিয়ার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত; সে সময় তাহাদের সম্বল এক কপর্দ্দকও ছিল না; তাহাদের পরিধানে ছিন্ন ও মলিন বসন; তাহারা গ্রামে গ্রামে কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিত; লোকে দয়া করিয়া যা কিছু দিত, তাহাতেই কোন রকমে তাহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

একদিন এই দুই ব্যক্তি ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ক্ষুদ্র নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই সময়ে সেই নগরে একদল ভ্রমণকারী নাট্য সম্প্রদায় কোন এক নাটকের অভিনয়ে ব্যাপৃত ছিল। পূর্ব্বকথিত যুবক দুইটি এই নাট্যসম্প্রদায়ের অধীনে চাকরী প্রার্থনা করিল, তাহারা বলিল যে, "তোমরা আমাদের দুই জনকে তোমাদের সমবেত গানের গায়ক স্বরূপে নিযুক্ত কর।" অমনি তাহাদের কণ্ঠস্বরের পরীক্ষা লওয়া হইল। পরীক্ষার ফলে এক জনের কণ্ঠস্বর অনুপযুক্ত বিবেচিত হইল, তাহার ভাগে চাকরী জুটিল না, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে চাকরী দেওয়া হইল; নাট্যসম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিল, যে এই দ্বিতীয় ব্যক্তি ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে।

যাহার কণ্ঠস্বর একদল ভ্রমণকারী নাট্যসম্প্রদায় কাজের উপযুক্ত বিবেচনা করে নাই, তিনি বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র য়ুরোপে শ্যালাপিন (Shalapin) নামে পরিচিত ও রুশিয়ার সর্ব্বপ্রধান গায়কদিগের মধ্যে একজন। আর যিনি সৌভাগ্যক্রমে নাট্যসম্প্রদায়ের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহার নাম ম্যাক্সিম গোরকী। ইনি স্বীয় রচনাগুণে দেশব্যাপী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এমন কি প্রতিপত্তিতে তিনি আজকাল কাউণ্ট টয়লস্‌টয় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন।

খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের পূর্ব্বে, গোরকীর যে কত প্রকার আশ্চর্য্য অভিনব ও কষ্টপ্রদ অবস্থান্তর ঘটে, তাহার ইয়ত্তা নাই; আর কোনও ব্যক্তির জীবনে এরূপ ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ম্যাক্সিম গোরকীর জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বাস্তব জীবনের ঘটনা উপন্যাস অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়জনক। এইক্ষণে ম্যাক্সিম গোরকীর বয়ঃক্রম ৩৪ বৎসর আন্দাজ। এই সময়ের মধ্যে প্রথম ২৪ বৎসর তিনি যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, কত অসমসাহসিক কার্য্যে হাত দিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। বলিতে কি, অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই গোরকীর ন্যায় কষ্টভোগ ঘটিয়াছে।

নিজনি-নোভো-গোরোডে গোরকীর জন্ম হয়। গোরকীর পিতা, সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীর সন্তান ছিলেন, তথাপি তাঁহার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, অতি কষ্টে গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। অতি শৈশবেই গোরকী পিতৃহীন হয়েন, মাতাও এই সময়ে গোরকীকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। অতঃপর, গোরকীর মাতামহ, কিছুদিন তাঁহাকে স্নেহ ও যত্নের সহিত প্রতিপালন করেন।

দশ বৎসর বয়ক্রম সময়ে গোরকী এক জুতা নির্ম্মাণকারীর নিকট শিক্ষানবিশ নিযুক্ত হয়েন। ইহার পূর্ব্বে মাস ৬।৭ তিনি স্কুলে পড়িয়াছিলেন। এই জুতানির্ম্মাণকারী গোরকীর প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিত; গোরকী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সেখান হইতে

পলায়ন করেন। ইহার পর কিছুদিন তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। এই সময় তাঁহার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। তিনি এই অল্প বয়সেই রুশিয়ার শত শত ক্রোশ পদব্রজে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে-কোন কাজকর্ম্ম যোগাড় করিতে পারিতেন তাহাই করিতেন, কাজকর্ম্ম না জুটিলে উপবাস করিতে হইত। তিনি যে সকল সামান্য সামান্য কাজকর্ম্ম করিয়াছেন, সে গুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিলে দুই পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। এই সময়ে তিনি এতই কষ্ট ভোগ করেন যে, ভল্‌গানদী-স্থিত একটি ষ্টিমারের পাকশালায় সামান্য ভৃত্যের কার্য্য পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হন। এই পাকশালার অধ্যক্ষ গোরকীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিত। এই ব্যক্তির লেখাপড়ার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুরাগ ছিল এবং তাহার নিকট কতকগুলি পুস্তকও ছিল। গোরকীর অবকাশ কালে তাঁহাকে এই সকল পুস্তকগুলি পড়িতে দেওয়া হইত। এই সকল পুস্তক পাঠে যে সময়টুকু কাটিত তাহা গোরকীর নিকট অতিশয় সুখের বলিয়া বোধ হইত। সে সময় তিনি নিজ দুরবস্থার কথা একবারে ভুলিয়া গিয়া যেন এক অজ্ঞাত কল্পনারাজ্যে বাস করিতেন। জ্ঞান লাভের স্পৃহা গোরকীর স্বভাবজাত বলিয়া বোধ হয়। এমন কি তিনি একবার কাজানের এক কলেজে ভর্ত্তি হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন নাই; বলিয়াছিলেন, যে সে কলেজে গোরকীর ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির স্থান নাই।

গোরকীর পর্য্যটনপ্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী ছিল। সেই জন্য তিনি কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে প্রাণধারণের জন্য কখন বা ঝাড়ুদারের কার্য্য, কখন বা রুটীওয়ালার চাকরী, কখন বা উদ্যানরক্ষকের কার্য্য করিতেন। কখন বা ফলমূল মাথায় করিয়া বাড়ী বাড়ী ফেরি করিয়া বেড়াইতেন। কখন বা রাস্তায় রাস্তায় খবরের কাগজ বেচিতেন। এবং কখন বা রেলের পাহারাওয়ালার কাজ করিতেন। এই সময়ে জীবন ধারণের জন্য তিনি হাতের কাছে যে কাজ পাইতেন, তাহাই করিতেন। কিন্তু এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাঁহার অধ্যয়নের বিরাম ছিল না; পছন্দমত পুস্তক পাইলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। এক সময়ে তিনি এমনই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান শূন্য হইয়াছিলেন, যে আত্ম-হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং কিছুদিন জীবন্মৃত অবস্থায় যাপন করেন।

ইহার পরই গোরকীর জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরিল। নোভোগোরোডের জনৈক আইন-ব্যবসায়ী নিজ সেরেস্তায় গোরকীকে নিযুক্ত করিলেন। ইনি গোরকীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অধ্যয়নস্পৃহা ও কার্য্যকুশলতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে ও সকল বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, এই মহাত্মার বিষয়ে গোরকী বলেন যে, "আমি সকল বিষয়ে এই মহানুভব ব্যক্তির নিকট ঋণী। আমার জীবনের সেই বিষম সন্ধিস্থলে এই মহাত্মার সহানুভূতি ও সাহায্যই আমার জীবনের গতি অন্যদিকে ফিরাইয়াছিল।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গোরকীর পর্য্যটনপ্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী ছিল। এই সময় পুনরায় গোরকীর হৃদয়ে পর্য্যটনস্পৃহা অতিশয় বলবতী হইয়া উঠিল; অমনি তিনি পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পর্য্যটন করিতে করিতে রুশিয়ার দক্ষিণভাগস্থিত ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত আসিয়া টিফ্‌লিসে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তিনি একটি রেলের চাকরী পাইলেন। এই স্থানেই কালুজিন (Kaluzyn) নামক এক ব্যক্তির সহিত গোরকীর পরিচয় হইল। কালুজিন গোরকীর কল্পনাশক্তির পরিচয় পাইয়া এতদূর মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি গল্প লিখিবার জন্য গোরকীকে ধরিয়া বসিলেন। গোরকীও কালুজিনের নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া একটি গল্প লিখিলেন, এবং সেই গল্পটি, টিফ্‌লিসের, "কাভকাজ" (Kavkaz) নামক খবরের কাগজে ছাপিবার জন্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে "কাভ-কাজ" পত্রে এ গল্পটি প্রকাশিত হইল। গল্পটীর যথেষ্ট সুখ্যাতি হইল এবং গল্পলেখকের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বলিতে গেলে এই এক গল্প লিখিয়াই ম্যাক্সিম গোরকী বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। এইরূপে উৎসাহ

পাইয়া তিনি রীতিমত লেখক হইবার সংকল্প করিলেন। এবং সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে রুশিয়ার বিখ্যাত লেখক ও সম্পাদক কারোলোংকোর (Karolonko) সহিত গোরকীর পরিচয় হইল। এই সময় হইতে তিনি তাঁহার শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিতে লাগিলেন; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার খ্যাতি রুশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

বর্ত্তমান সময়ে গোরকীর বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর অতিক্রম করে নাই, এবং ছোটো ছোটো গল্প, উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতিতে তিনি সাত খণ্ডের (ভলুম) বেশী পুস্তক রচনা করেন নাই। তথাপি য়ুরোপে এমন গৃহ নাই যেখানে গোরকীর নাম ধ্বনিত না হয়। সকলের মুখেই গোরকীর সুখ্যাতি। বার বৎসর পূর্ব্বে যে রুশিয়াতে গোরকীর কষ্টের সীমা ছিল না, যেখানকার লোক ঘৃণার সহিত গোরকীকে তাড়াইয়া দিত, আজ সেই রুশিয়াতেই তিনি দেবতার ন্যায় পূজিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যিনি কপর্দ্দকশূন্য ছিলেন, দিন গেলে কি আহার করিবেন এরূপ সম্বল যাঁহার ছিলনা, তিনি আজ লক্ষ্মীর বরপুত্র হইয়াছেন। গতিক দেখিয়া মনে হয়, যে রুশিয়া বুঝি বা বহুকালব্যাপী কঠোর রাজনৈতিক অত্যাচারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইবে, যদি ভাগ্যক্রমে রুশিয়া অভিনব রাজনৈতিক অধিকার লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এবিষয়ের জন্য, রুশিয়ার অধিবাসিবর্গকে তাঁহাদের অন্যান্য নেতৃবর্গের নিকট অপেক্ষা, ভূতপূর্ব্ব জুতানির্ম্মাণকারীর শিক্ষানবিশ ও জাহাজের পাকশালার সামান্য ভৃত্য ম্যাক্সিম গোরকীর নিকট অধিকতর ঋণী থাকিতে হইবে। (সঙ্কলিত)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

স্ত্রীশিক্ষা।

মান্দ্রাজ প্রদেশে বিখ্যাত ত্রিপতি নামক তীর্থস্থানের সন্নিকটে ত্রিচন্নুর নামে একটী সহর আছে। ত্রিচন্নুরের নামান্তর পদ্ম সরোবর। বিগত পঁচিশ বৎসর হইতে এই স্থানে মাধ্ব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের এক বৃহৎ সভার অধিবেশন হইতেছে। ঐ সম্প্রদায়স্থ বহুসংখ্যক নরনারী এই সভায় সমাগত হইয়া মাধ্ব সম্প্রদায়ের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ধর্ম্মগুরু মাধ্বাচার্য্যে নামানুসারে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। মাধ্বগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী সম্প্রদায়। ইহারা নিতান্ত গোঁড়া ও রক্ষণশীল। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। সভার বিগত অধিবেশনে পুণাপ্রবাসিনী শ্রীমতী রঙ্গাম্মা মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত দুই সহস্র নরনারীর সম্মুখে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই অল্পবয়স্কা মহিলার জ্ঞান, উৎসাহ ও ওজস্বিনী ভাষায় সভাস্থ সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। অনেক শিক্ষিত লোক ইঁহাকে শ্রীমতী এনি বেসাণ্টের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে শ্রীমতী রঙ্গাম্মার বক্তৃতাটীর সার মর্ম্ম প্রদান করিতেছি। মহীশূর ইঁহার জন্মস্থান। সেখানে "মহারাণীর কলেজে" বিদ্যাভ্যাস করিয়া এখন পুনায় অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন।

সর্ব্বশক্তিমান শ্রীনিবাস, পরম গুরু ভগবান মাধ্বাচার্য্য, সাধু পুরন্দর দাস ও সকল সাধুজনের চরণে প্রণত হই।

নারীদিগের শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না, এই বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ অনেক লোকে বলে, —স্ত্রীলোকের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? এই শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষাকে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় মাত্র মনে করে। তাহাদের এই ভয়, যে স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিলেই স্বাধীনতার দাবী করিবে এবং আর পুরুষদিগের ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিবে না। কিন্তু 'শিক্ষা' কথাটার অর্থ 'চেষ্টা'। শিক্ষাবলে লোকে সৎ বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করিয়া সংসারে সুখী হয় ও পরকালে মুক্তি উপার্জ্জনে সমর্থ হয়। শিক্ষা মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগ্রত করে। এই অনুসন্ধিৎসা নরনারী সকলের পক্ষেই অতি মূল্যবান্। সুতরাং পুরুষ ও স্ত্রীজাতি উভয়েরই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রাদিতে শিক্ষাবিহীন মানুষকে গোজাতির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ধর্ম্ম অর্থ ও

মোক্ষ লাভের জন্য শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষিত পুরুষও অশিক্ষিত নারীর মিলিত জীবন কিছুতেই সুখের হইতে পারে না। যে গৃহে এই প্রকার দম্পতি বাস করে সেই গৃহ বলীবর্দ্দ ও মহিষ কর্ত্তৃক বিভিন্ন দিকে আকৃষ্ট শকটের ন্যায় শঙ্কটাবস্থাপন্ন। পুরুষ নারীর এবং নারী পুরুষের সাহায্য লাভ করিবে ইহাই কি প্রকৃতির বিধান নহে? পুরুষ ও নারী একপ্রাণ হইবে ইহাই ঈশ্বরের ও সাধুদিগের অভিপ্রায়। অবোধ হস্তী যেমন কর্দ্দম নিক্ষেপ দ্বারা আপনারই দেহ মলিন করে, অনেক অল্পবুদ্ধি পুরুষও তেমনি নারীদিগকে অজ্ঞান রাখিয়া আপনারাই দুঃখভাগী হয়। পুরুষদিগকে কত কাল নারীর শাসনাধীনে থাকিতে হয় এবং নারীকে কত কাল পুরুষের অধীনে থাকিতে হয় এবিষয় যদি আমরা শান্তচিত্তে আলোচনা করি, তবে এই উভয়ের মধ্যে কাহার শিক্ষার অধিক প্রয়োজন, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কেই নারীগর্ভে বাস করিতে হয়। প্রথমে পুরুষের বিষয়ই বিবেচনা করা যাউক। এখন যে সকল পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে, তাহারা যে শুধু দশটী মাস নারীর উদরে কালযাপন করিয়াছে তাহা নহে। শৈশবে, বাল্যকালে তাহারা নারীর হস্তেই প্রতিপালিত হইয়াছে। সুতরাং নারী যদি শিক্ষিতা হয়, গর্ভাবস্থায় তাহারা ভাল পুস্তক পাঠ করিবে, ভাল বিষয়ে চিন্তা করিবে, এবং ভাল সন্তান প্রসব করিবে। নারী যদি ভাল হয়, তাহার সন্তানও ভাল হইবে। সিংহী সিংহই প্রসব করে। নারী যদি বর্ণজ্ঞান বিহীন ও নির্ব্বোধ হয়, তাহার সন্তানও জননীর অনুযায়ী হইবে। নিম গাছে কখনও সুমিষ্ট আম ফলে না। যেমন মাতা তেমন সন্তান, যেমন সুতা তেমন কাপড়।

পুরাকালে দেবর্ষি নারদ প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্ত করিবার অভিপ্রায়ে গর্ভাবস্থায় তাহার জননীর নিকট বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ এই জন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বিষ্ণুর প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। দেবতাদিগের ধনাধ্যক্ষ কুবেরের জননী গর্ভাবস্থায় বেদ পাঠ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার সন্তান পরম বেদজ্ঞ হইয়াছিলেন। শাস্ত্রোক্ত এই সকল দৃষ্টান্ত পাঠে জানিতে পারা যায়, যে গর্ভাবস্থায় নারী যে জ্ঞান লাভ করে, প্রকৃতির নিয়মে সন্তান তাহার অধিকারী হয়।

কিন্তু অন্তঃসত্বাবস্থায় গ্রন্থাদি পাঠ করিতে হইলে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যাশিক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ ইচ্ছা করিবা মাত্রই ত আর বিদ্যাভ্যাস সম্ভব হয় না। পিপাসা উপস্থিত হইলে তখনই কিছু কূপ খনন করা যায় না; যুদ্ধ ঘোষণা হইলে অস্ত্র শিক্ষার সময় থাকে না।

মাতার বুদ্ধিগুণেই সন্তান ধর্ম্মপরায়ণ ও দীর্ঘজীবী হয়। মাতাই সন্তানগণের উন্নতির শ্রেষ্ঠতম সহায়। ধ্রুব তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা সুশিক্ষিতা ছিলেন, এজন্য তাঁহার উপদেশে ঈশ্বরের করুণা ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহামুনি কশ্যপের কৃপায় অরুণের জন্ম হইয়াছিল, কিন্তু মাতার অজ্ঞতার জন্য তিনি বিকলাঙ্গ হইয়াছিলেন। গান্ধারীর গর্ভাবস্থায় কুন্তীগর্ভে ধর্ম্মরাজের জন্মসংবাদ পাইয়া তাঁহার হিংসাবৃত্তি এতই জলিয়া উঠিয়াছিল, যে তিনি প্রস্তরাঘাতে আপনার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার পুত্রগণ অসাধু হইয়াছিল এবং স্ববংশ ও ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই দেখা যায়, যে সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল প্রধানতঃ মাতার উপরই নির্ভর করে। সুতরাং নারীগণের পক্ষে বিদ্যা ও শাস্ত্রাভ্যাস অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রসবকালে স্ত্রীলোকই প্রসূতির নিকটে থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যবিদ্যা ও শিশুপালন বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন। নতুবা সময় সময় শিশু ও প্রসূতি উভয়েরই মহা অনিষ্ট হইতে পারে। স্ত্রীজাতির অজ্ঞতানিবন্ধন ভারতবর্ষে শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্ত্রীলোকের উপরেই শিশুপালনের ভার ন্যস্ত থাকে,

সুতরাং স্ত্রীলোক শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হইলে শিশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

মানুষ যখন যৌবনে উপনীত হয় মাতাই তখন তাহাকে সাধুপথে রাখিতে সমর্থ হন। সুতরাং স্ত্রীলোকের শিক্ষা কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে?

যৌবনকালে পুরুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার প্রধানতঃ স্ত্রীর উপরই অর্পিত থাকে। পত্নী শিক্ষিতা হইলেই এই কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, নতুবা নহে।

চতুরাশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ আশ্রমই শ্রেষ্ঠ। পাখীর পক্ষে বৃক্ষ ও বৃক্ষশাখার যেমন প্রয়োজন, এই আশ্রমে পুরুষের পক্ষে উৎকৃষ্ট স্ত্রীরও তেমনই প্রয়োজন।

ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্ত্রীগণ স্বামীর সাহায্য করিয়া থাকেন। অশিক্ষিতা পত্নী সুচারুরূপে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। অশিক্ষিত নরনারী বাস্তবিকই অন্ধ। কারণ মানুষের পক্ষে জ্ঞানই প্রকৃত চক্ষু। শুধু জ্ঞানের সাহায্যেই নরনারী আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে।

নারীরা সাধ্বীও শিক্ষিতা হইলে পুরুষদিগের মুক্তির পথ সহজ হয়। প্রাচীনকালে তিনটী রমণীর সতীত্বের প্রভাবে ভীত হইয়া দেবতাগণ তাঁহাদের স্বামীগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সতীত্বের দৈবশক্তি দেবতাগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিল। অনেকেই জানেন, প্রাচীনকালে সুবিখ্যাত বিশি নাম্নী তরুণী, চন্দ্রহাসের পত্র পাঠ করিয়া কিরূপে তাঁহার জীবন রক্ষা ও স্বীয় পিতাকে হত্যাপরাধ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে রাজ্য অরাজকতা হইতে রক্ষা পাইয়া এক মহামতি রাজা লাভ করিয়াছিল, এবং তিনিও সুপতি লাভ করিয়াছিলেন।

লীলাবতী গণিত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। ত্রিবেণী বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্রী ছিলেন।

সৃষ্টিকালে ঈশ্বর লক্ষ্মী ও পার্ব্বতীকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের শিক্ষিতা স্ত্রীগণের বিষয়ে আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সে সময়ে স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। শিক্ষিতা নারীগণ স্ববংশ ও স্বদেশের পরম হিতকারিণী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই জ্ঞান লাভের উপদেশ দিয়াছেন, তিনি এবিষয়ে স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য করেন নাই। সাবিত্রী যোগবলে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদী আপনার বিশ্বাসবলে আপন সতীত্বও স্বামীগণের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সাংখ্যদর্শনকার মহামুনি কপিল আপন মাতাকে স্বীয় উদ্ভাবিত দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।

পুরুষের কল্যাণের জন্য নারী দায়ী। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীগণের বালকোচিত যুক্তি শুনিয়া আমাদের নিতান্ত দুঃখ হয়। শিক্ষা কথাটী স্ত্রীবাচক। শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীও নারী। সরস্বতীরই কৃপাবলে আমাদের মুনিঋষিগণ জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থাদি লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ যদি স্ত্রীশিক্ষাবিরোধী হইতেন তবে কখনই তিনি নারীকে শিক্ষাধিষ্ঠাত্রী দেবী করিতেন না। পুরুষ কেবল নারীরই সাহায্যে যশ ও বিত্ত লাভ করিতে পারে। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে স্ত্রীশিক্ষা স্থগিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ভগবৎ কৃপায়, বৃটিশ রাজের চেষ্টায় হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরূঢ় সেই সকল জাতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। ইংলণ্ডের রমণীগণ তাঁহাদের ভারতীয় ভগ্নীগণের ন্যায় অশিক্ষিতা হইলে ইংলণ্ড কি বর্ত্তমান অবস্থা লাভ করিতে পারিত? জাপানের প্রশংসা এখন জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু জাপান-রমণীগণ যদি অশিক্ষিতা হইতেন তবে কি জাপানীদিগের পক্ষে পরাক্রান্ত রুশ জাতিকে জলে স্থলে পরাজয় করা সম্ভব হইত? মিসেস্ বেসাণ্ট যদি মূর্খ হইতেন তবে কি বারাণসী ধামে "সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইত? হে ভারতের দেশহিতৈষীগণ,—যাঁহারা ইংলণ্ড, জাপান ও মিসেস্ বেসাণ্টের প্রশংসা করেন; হে বর্ত্তমান সভার নেতৃগণ,—

যাঁহারা দেশ সংস্কার করিতেছেন ;—হে দেশের পুরুষগণ! আপনারা বলুন, আমাদের কন্যাগণকে শিক্ষিতা না করিয়া আপনারা কিরূপে দেশকে উন্নত করিবেন? মহাকবি টেনিসন্ বলিয়াছেন, "নরনারীর উন্নতি একসূত্রে গ্রথিত। নারীর উন্নতিতে পুরুষের উন্নতি, নারীর অবনতিতে পুরুষের অবনতি।"

যে সকল বালিকা শৈশবে পতিহারা হয় তাহারা প্রকৃতই সাধ্বী। তাহারা এই সংসারের সকল ভাবনা চিন্তা হইতে বিমুক্ত। পরমেশ্বরকেই তাহারা একমাত্র রক্ষক ও পতি বলিয়া গ্রহণ করে। মানব জাতির কল্যাণোদ্দেশ্যে তাহারা জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় গার্হস্থ দায়িত্ব হইতে মুক্ত বলিয়া তাহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। বিধবা করিয়া ঈশ্বর তাহাদিগের অনিষ্ট করেন নাই। সংসারীদিগকে সন্ন্যাসী হইতে হইলে সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। বালবিধবাগণ ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সকল আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে। কেন তোমরা আমাদিগকে অজ্ঞতার মধ্যে রাখ এবং কুপথে চালিত কর? বাল-বিধবাদিগকে সুশিক্ষা দেও, তাহারা দেশে নব জীবন আনয়ন করিবে।

মনু কি একথা বলেন নাই, যে একটী নারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস যে গৃহে পতিত হয় সে গৃহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়? ভারতে এখন কত তরুণী সারা জীবন ক্রন্দনে অতিবাহিত করিতেছে! ইহাই কি দেশের দুর্গতির কারণ নহে? যদি নারীকে সুশিক্ষা দেও তবে এদেশ কি উন্নতির উচ্চতম স্তরে উঠিতে পারে না? হে শিক্ষিত পুরুষগণ! আপনারা এই গুরুতর বিষয়ে চিন্তা করুন এবং এখন হইতে স্ত্রীশিক্ষায় মনোযোগী হউন।

আত্মহত্যা না খুন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৩)

অসঙ্গত ব্যাপার।

মানুষের কার্য্য বুঝা ভার। মেরী চলিয়া গিয়াছেন, টম্ এখনও গৃহে ফিরেন নাই, কিন্তু মট্ বাড়ীর ঝি কুমারী নেলির সঙ্গে প্রেমালাপ জুড়িয়া দিলেন। নেলির তাহাতে আপত্তি নাই, সেরূপ আলাপ তার টমের সঙ্গেও চলে। উপরন্তু সে এক সৈনিক পুরুষের বাগ্‌দত্তা।

"বল্ দেখি নেলি, তুই কি সত্যি সত্যি আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসিস্ না?" মটের এই প্রশ্নে যেন নেলির বড়ই রাগ হইল, সে বলিল, "তা কি ক'রে হবে বলুন দেখি, তাও কি কখনও হয়? অসম্ভব!"

"কেন, ঐ যে সেদিন তোকে গির্জ্জা হইতে সেই সৈনিক পুরুষের সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে যেতে দেখ্‌লাম।"

"ও কিছু নয়, বুঝ্‌তে পাচ্ছেন তো। ও সাধারণ আলাপ মাত্র।"

"তবে তার সঙ্গ একেবারে ছেড়ে দে না?"

"ওরে বাপ্‌রে, তা হ'লে সে আমাকে একেবারে মেরে ফেল্‌বে। সে কি মানুষ? যেন একটা দৈত্যি।"

"তা হ'লই বা। আমি যদি তোকে এমন জায়গায় নিয়ে যাই যেখানে সে তোর কোনও খোঁজই পাইবে না। মনে কর্, হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী কোনও স্থানে—দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকা।"

"আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন।"

"না, সত্যি সত্যি, যাবি কি না বল্।" নেলি ভয় পাইয়া দৌড়িয়া রন্ধনশালায় পালাইয়া গেল এবং তাহাদের প্রেমালাপের উপর হঠাৎ একটা বৃহৎ যবনিকা পতিত হইল।

(৪)

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।

একদিন অতি প্রত্যূষে—অন্যান্য দিন যখন উঠেন তারও পূর্ব্বে উঠিয়া টম্ ভীত ও ত্রস্তভাবে ঘণ্টা বাজাইলেন

২৩৭

এবং নেলি আসিলে তাহাকে অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মটের কি হ'ল?" "ওমা, তিনি কি কাল রাত্রে ঘরে ছিলেন না"? এই বলিয়া নেলি দৌড়িয়া গিয়া বাড়ীওয়ালিকে খবর দিল। বাড়ীওয়ালি, "বাপ্‌রে কাল যে কুয়াসা হয়েছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই দিক্ ভুলিয়া নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছেন," এই বলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে টমের নিকটবর্ত্তিনী হইল। টম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কুয়াসা?"

"আপনি কি তাহা লক্ষ্য করেন নাই?"

"না, আমি সকাল সকাল এসে পড়া শুনা করে ১১টার মধ্যেই ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম, জানালার বাইরে আর নজর যায় নাই।"

"হায় হায়, বেচারি বুঝি মারা গেলেন। কখনও তো রাত্তিরে বাইরে থাকেন না।"

"না না, এত ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নাই। তিনি হয়ত কুয়াসায় রাস্তা ঠিক করতে না পেরে কোথাও রাত্রি যাপন করেছেন, এখুনই ফিরে আস্‌বেন এখন," এই বলিয়া টম্ শিস্ দিতে লাগ্‌লেন, যেন আর কোনও চিন্তার কারণ নাই।

আট্‌টার সময় মট্ রক্সডেলের নামে একখানা চিঠি আসিল, খামের উপরে Immediate (জরুরী) লেখা। যখন প্রাতরাশের সময়েও মট্ ফিরিলেন না তখন টম্ চিঠিখানা লইয়া নিজেই ব্যাঙ্কে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কেসিয়ারের নিকট চিঠিখানা দিয়া উদ্বিগ্নমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বৈকালে সহরময় হুলস্থুল পড়িয়া গেল, যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বহু সহস্র টাকার নোট ও মোহর লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

কর্ত্তৃপক্ষ চিঠিখানা খুলিলেন। চিঠি বিলিতে একটু দেরি হইয়াছিল। কেন না, ঠিকানা অস্পষ্ট ছিল। চিঠি রমণীর হাতের লেখা। উহাতে লেখা ছিল "পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া হইবে না। আমাকে আর দেখিতে আসিও না, আমাকে চিরদিনের মত ভুলিয়া যাও। তোমাকে আমি কখনও ভুলিব না।" কোনও স্বাক্ষর নাই।

হতবুদ্ধি মেরী বলিলেন, তিনি এই পত্রের কোনও খবর জানেন না। নেলি জবানবন্দী দিল, যে পলাতক ম্যানেজার তাহাকে সঙ্গিনী হইতে বলিয়াছিল। তাহার কথা মত দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার পথে বিশেষ অনুসন্ধান করা হইল, কোনই ফল হইল না। টম্ পিটার্স শোকে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। কয়েক মাস গত হইল। পুলীস পলাতকের সকল সম্পত্তি হস্তগত করিল। ক্রমশঃ সকল গোলমাল থামিয়া গেল। যে যার বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল।

(৫)

অদ্ভুত স্বপ্ন।

একদিন টম্ পিটার্সের সঙ্গে মেরীর দেখা হইল। বহুদিন পরে মেরী শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। মটের নিরুদ্দেশের পরে লজ্জায় তিনি বহুদিন ঘরের বাহির হন নাই, শয্যাশায়ী ছিলেন। মটের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে এখনও তাঁহার আশা আছে। কিন্তু সেই চিঠির কথা মনে পড়িলে আর তাঁর শরীরে রক্ত থাকে না, জল হইয়া যায়। তারপর নেলির জবানবন্দী। যাহা হউক মেরী টমের অভিবাদন প্রত্যাখ্যান করিলেন না। তাঁর বিশ্বাস টম্ এই রহস্যের অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত আছে এবং টমের সঙ্গে ভাব করিলে মটের খবর জানিতে পারিবেন। বিশেষতঃ টমের বেশের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং মুখে আর সেই মাটির পাইপ্ নাই। তাই হৃদয়ের ভাব চাপিয়া মেরী টমের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন।

"আপনি কি মটের কোনও খবর জানেন?" টমের এই প্রশ্নে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া মেরী বলিলেন, "আপনি কি আমাকে তাঁর সহকারিণী মনে করেন?" টম্ অপ্রস্তুত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "না তা বলিতেছি না, আপনার কাছে চিঠি লিখিতেও পারেন, আপনি তো আর পুলীসে খবর দিবেন না?"

"কেন, খবর দেব না? তিনি নির্দ্দোষী হইলেও, দোষ ক্ষালনের জন্য আদালতের সম্মুখীন হওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।"

"আপনার কি এখনও বিশ্বাস, মট্ নির্দ্দোষী?"

"নিশ্চয়ই! আপনার কি তাই বিশ্বাস নয়?"

"বিশ্বাস করিতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু বোধ হয় সে পথ আর নাই! হায় হতভাগ্য মট্! ধন্য অর্থ! তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই, কত সাধু সজ্জন তোমার প্রলোভনে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে!"

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। টম্ ঘন ঘন মেরীদের বাড়ী যাইতে লাগিলেন। ক্রমে মেরীর মনে হইল, মট্কে বিশ্বাস করা ভাল কাজ হইয়াছিল না। আরও মনে হইল টম্কে অবিশ্বাস করাটা ভাল হয় নাই। সেজন্য তাঁর মনে অনুতাপ হইল, অনুতাপ হইতে টমের প্রতি শ্রদ্ধা আসিল এবং শ্রদ্ধা হইতে ভালবাসা জন্মিল। সুতরাং টম্ যখন ভালবাসা জানাইলেন—যে ভালবাসার চিহ্ন প্রথম দিন হইতেই বিদ্যমান ছিল, মেরী আর তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন না। ব্যবসাদার পিতা অনলে ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহ স্থির হইয়া গেল। টম্ দেখিলেন তাহার যথেষ্ট আয় আছে, সুতরাং বিবাহে আর বিলম্বের প্রয়োজন কি?

কিন্তু মেরীর ভাগ্যে সুখ নাই। যেদিন হইতে টমের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা স্থির হইল সেই দিন হইতেই তাঁহার পুরাতন স্মৃতি সকল নবীভূত হইয়া উঠিল। নানারূপ অদ্ভুত চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন মট্ আসিয়া তাঁহাকে ধম্কাইতেছেন। বিবাহের দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাঁহার অশান্তিও ততই বাড়িয়া উঠিল। আগামী কল্য বিবাহের দিন। আজ বৈকালে মেরী ও টম্ টেম্স্ নদীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, হোটেলে আহার করিয়া রাত্রে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মেরীর চক্ষে ঘুম নাই। একটু তন্দ্রা আসে, কার যেন পদশব্দে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। অবশেষে শেষ রাত্রে তাঁহার একটু ঘুম আসিল। তিনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিলেন। দেখিলেন মট্ তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে কট্মট্ করিয়া তাকাইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতেছে। ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মেরী প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি পলাইবার পথে জলে ডুবিয়া মরিয়াছ?" উত্তর হইল "আমি কখনও ইংলণ্ড পরিত্যাগ করি নাই!" "ইংলণ্ড পরিত্যাগ কর নাই?" বলিয়াই যেন মেরীর দাঁত লাগিল। ভূত তাঁহার দিকে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

"তবে এত দিন কোথায় ছিলে?" "অতি কাছে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে।" "তবে কি টম্ তোমাকে টাকার লোভে হত্যা করিয়াছে?" মট্ অতি খেদের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। মেরী বলিলেন—"আমি তো তাকে পূর্ব্ব হইতেই অবিশ্বাস করিয়াছিলাম!" "তুমি তাহাকেই তো বিবাহ করিতে যাইতেছ"—ভূত দৃঢ়ভাবে উত্তর করিল। "না না, মট্, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব না।" এই বলিয়া মেরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বেলা হইয়াছে, পিতার সঙ্গে পরামর্শ করিবার কথা মনেই আসিল না, ভয়বিহ্বল মেরী পুলীসে যাইয়া স্বকীয় সন্দেহ ব্যক্ত করিলেন। খানাতল্লাসীতে টমের গৃহে ব্যাঙ্কের নোট ও হারান কাগজ পত্র, মুদ্রা পাওয়া গেল। মেরীর স্বপ্ন লোকের মনের মধ্যে বসিয়া গেল। এখন টেম্সের মৃতদেহের উপর পুলীসের দৃষ্টি পড়িল। মটের মৃতদেহ পাইতে বিলম্ব হইল না। এত দিনের মৃতদেহের মুখ চেনা গেল না, বুকের পকেটে নোট্বুক দেখিয়া সকল সন্দেহ দূরীভূত হইল। মেরীর বিশ্বাস, মট্ কোনও সরকারী কাজের জন্যই টাকা গৃহে আনিয়াছিলেন, টাকার লোভে টম্ কুয়াসার সুযোগে মট্কে সান্ধ্যভ্রমণের সময় টেম্স্ নদীতে ফেলিয়া দিয়া টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। জুরীরা রায় দিলেন, যে মট্ টমের সঙ্গে ভাগ করিয়া লইবার জন্যই বা পলায়ন করিবার জন্য টাকা আনিয়াছিলেন। টম্ একা সব টাকা লইবার জন্য মট্কে হত্যা করিয়াছে; মেরীর প্রতি ভালবাসা হত্যার অন্যতর কারণ। সুতরাং হত্যা অপরাধে টম্ পিটার্সের ফাঁসীর হুকুম হইল।

(৬)

অপরাধীর আত্মকথা।

ভাই পাঠক, তুমি যখন এই গল্প পড়িবে তখন আমি পরলোকে, কিন্তু কোন্ পাপে, তাহা তুমি জানিলে না।

আমাকে জজ ও জুরী নিজেকে হত্যাকরার অপরাধে ফাঁসী দিয়াছেন। টম্ পিটার্স আর মট্ রক্সডেল্ দুই জন নয়, একই ব্যক্তি। আমিই রক্সডেল্, আমিই পিটার্স। যৌবনে যখন গোঁফ্‌দাড়ী উঠিল না, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য আমি গোঁফ্‌দাড়ী পরিতে আরম্ভ করিলাম। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হইবার পর এক দিন গোঁফ্‌দাড়ী খুলিয়া স্বীয় চেহারা দেখিয়া এক খেয়াল চাপিল। দাড়ী খুলিয়া ফেলিলে তো আর কেহই চিনিতে পারিবে না। খেয়াল পাকা মতলবে পরিণত হইল। তার পর দুই নামে দুই জনের চার্জ্জ দিয়া এক ঘরে বাস করিতে লাগিলাম। যে কয় দিন বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে ছিলাম, আমাকে যথেষ্ট মাথা ঘামাইতে হইয়াছে। কিন্তু কেহ সন্দেহ করে নাই, কেহ টম্ মট্‌কে এক সঙ্গে কখনও দেখে নাই। বাড়ী-ওয়ালী সন্দেহ করিবার সুযোগ পায় নাই। আমাদের আহারের ঘরে কাহারও প্রবেশ নিষেধ ছিল। যখন একত্র ডিনার খাইতাম, দুই গলায় কথা বলিয়া হাসিয়া একাকার করিতাম। অধিকাংশ সময় বিভিন্ন সময়ে আহার করিতাম। টম্ গির্জ্জায় যাইত না, শুইয়া থাকিত। মট্ সাজগোজ করিয়া গির্জ্জায় যাইত। বেশ বদ্‌লাইবার সাজ সরঞ্জাম ও কৃতিত্ব আমার যথেষ্ট ছিল, এক মুহূর্ত্তে পিটার্স রক্সডেলে পরিণত হইত। আমি রক্সডেলের পলায়ন সাব্যস্ত করিলাম, নেলিকে সঙ্গে যাইবার জন্য বলিলাম এবং সেই Immediate পত্র জাল করিয়া পোষ্ট করিলাম। মটের পলায়নের দিন তাহার কাপড় চোপড় টেম্‌সে বিসর্জ্জন দিবার জন্য গেলাম, কুয়াসায় কে যেন আমার হাত হইতে তাহা ছিনাইয়া লইল। এখন দেখিতেছি সে হতভাগ্য সেই কাপড় পরিধান করিয়াই মারা পড়িয়াছে। কিন্তু মেরীর প্রেমই আমার সর্ব্বনাশ করিল। মট্ লীলা শেষ হইল, কিন্তু মেরীকে ভুলিতে পারিলাম না। একবার তাহার সঙ্গে বিবাহ হইয়া গেলে আর তাহার কাছে রহস্য ভেদ হইলেও কোন ভয় ছিল না। কিন্তু তাহা হইল না। মানুষের বুদ্ধিতে যাহা কুলায় তাহা করিয়াছিলাম, আট্ ঘাট্ সব বাঁধিয়া ছিলাম। কিন্তু মানুষের উপরে যে একজন আছেন তাহা তখন মনেও পড়ে নাই। তাই এই ফল ভোগ! একটী বালিকার স্বপ্ন নিয়মিত করিবার ভার মানুষের হাতে নাই। সকল কথা প্রকাশ করিয়া আদালতকে বোকা বানাইতে পারিতাম, কিন্তু ফল হইত চৌর্য্যাপরাধে কারাবাস। তাহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ! তবুও একটা চিন্তা আমাকে ত্যাগ করিতেছে না—আমি আত্মহত্যা করিলাম, না আদালত নরহত্যা করিলেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গান্ধারী।

(১)

মঙ্গল-উৎসব মাঝে মন্থর গমনে
দিল দেখা হিরণ্ময়-রথ,
ধ্বনিল অযুত শঙ্খ গভীর স্বননে,
পুষ্প-মাল্যে আবরিল পথ!
বিস্ময়-আনন্দে রাজ-দম্পতির পানে
নেহারিল লক্ষ নরনারী—
বসে আছে অন্ধনৃপ ধৃতরাষ্ট্র-বামে
বদ্ধ-নেত্রা নবোঢ়া গান্ধারী!

(২)

সজ্জিত বিশাল চমূ, ধ্বনি দশদিশ
বাজিতেছে সমর-বাজনা,
মহারাজ দুর্য্যোধন বিজয়-আশীস্
মাতৃ-পদে করিলা যাচনা!
ভাবী অমঙ্গল-ভয়ে উঠে ঝঞ্ঝা বুকে,
ত্রস্তে মুছি' নয়নের বারি—
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' ধীরে ম্লান মুখে
কহিলেন জননী গান্ধারী!

(৩)

পুণ্যভূমি কুরুক্ষেত্রে ক্রন্দন-কল্লোল
উঠিতেছে রণ অবসানে,

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী স্থির অচঞ্চল
বীরারাধ্য সুখদ শয়ানে!
প্রশান্ত হৃদয়ে বসি' শত পুত্র-হারা
সন্তান-শিয়রে আপনারি—
প্রাণ-পাখী মুক্ত যেন ত্যজি' দেহ-কারা,
মহা ভাবে বিহ্বলা গান্ধারী।

(৪)

সুশোভিত 'দ্বৈপায়ন' শ্যাম অরণ্যানী
পশ্চিম পারশে জাহ্নবীর,
মুখর বিহগবৃন্দ হরে দুখ-গ্লানি,
বহে সদা মৃদুল সমীর!
ত্যজি' সুখ-রাজ-ভোগ কুটীর-প্রাঙ্গনে
কৃষ্ণাজিন পুলকে বিস্তারি'—
পতি সার্থে আমরণ যুক্ত প্রাণ-মনে
ধ্যান-মগ্না মহিষী গান্ধারী!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—তপস্যার আরম্ভ।

দেবি, এবার যখন বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলাম, তখন কত বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! অনন্তকালের জন্য আত্মিক মিলনের ব্রত লইয়াছ; তুমি নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছ। মধ্যে মধ্যে তুমি ম্লান হইতে। মলিন মুখ দেখিলেই আমার মনে হইত, বোধ হয় অধিক চাপ দেওয়া হইতেছে। বন্ধুরাও সেই কথা বলিতে লাগিলেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক আহার সংগ্রহ করিবার জন্য কায়-মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যেখানে যাহা ভাল পাইতাম, একান্ত হৃদয়ে তোমাকে উপহার দিতে লাগিলাম। মনের ক্ষোভ ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল। ভক্তচরিত্র পাঠ, সাধুসঙ্গ সম্ভোগ, সকাল সন্ধ্যায় নাম গান করা, খুব ভোরে আলোচনা করা, এ সকলই আরম্ভ হইল। আর শেষ জীবন পর্য্যন্ত ইহাতেই তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিত। নিশা অবসানে মনের ভার ও দুঃখ সকলই তুমি বলিতে। কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আমার সাধ্যমত তাহা বলিয়া দিতাম। যখন পারিতাম না, দুজনে মিলিয়া প্রার্থনা করিতাম। এইরূপে সমুদায় শারীরিক অভাব ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলে, এবং সেবার ধর্ম্মে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে লাগিলে। সন্তানদিগকে ভালবাসিতে কিন্তু আমার মনে হয়, আমার প্রতি ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। তুমিও জানিতে, আমার শরীরের অভাব হইলে কেবল একমাত্র স্বর্গীয় খাদ্যে সে অভাব দূর করিতে পারে। সংসার পথে চলিয়া মন ক্লান্ত হইলে প্রায়ই বলিতে, "চল একবার গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসি।" অল্পেতেই তুমি সফলযত্ন হইতে। প্রসন্ন চিত্তে আবার দৈনিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে। যখন শারীরিক ভাব অধিক জাগরিত হইয়া উঠিত, নিজগুণে তুমি মহাব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে; এবং মায়ের মত আমাকে রক্ষা করিতে।

এ সময়ে আমাদের মনের আগুণ কিরূপে জ্বলিত, কে নির্ব্বাণ করিত, কোথা হইতে শান্তিসলিলে অভিষিক্ত হইতাম, ও নূতন উৎসাহের সহিত আবার দুজনাই চলিতাম, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। না জানিবার কারণও ছিল। যদি ব্রত ভঙ্গ হয়, সমুদয় নষ্ট হইবে, হাস্যাস্পদ হইবে, এ ভয় ছিল। তখনকার চোখের জলের কথা কেবল তুমি আমি জানিতাম, আর ভগবান জানিতেন।

এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি যেন বিভিন্ন দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে কখনও নিজে উপসনার কায কর নাই। এখন হইতে অনেক সময় তুমি উপাসনা করিতে, আমি যোগ দিতাম। প্রাণে সংগ্রাম ছিল, আকুলতা ছিল, তাই তোমার সজীব উপাসনা দুজনকেই অতি সরস রাখিত। ক্রমে অন্যের বাড়ীতে গিয়া পারিবারিক উপসনায় সাহায্য করিতে লাগিলে। প্রতিদিন রাজপথে হাঁটিয়া ভাই পরেশনাথের বাটীতে উপাসনা করিতে যাইতে।

১৮৮৩ সালে ভগবান আর একটী পরীক্ষা আনিলেন।

এই পরীক্ষাতে বুঝিতে পারিলাম, তুমি আমা অপেক্ষা কত শ্রেষ্ঠ। আগষ্ট মাসে দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর জ্বর হয়। একদিন খুব বাড়িল। প্রাতঃকালে পরেশ বলিলেন "বিপদের আশঙ্কা আছে, আজ আফিসে যাইবেন না।" আমি বাটীতেই রহিলাম। বিকালবেলা ইউরীমিয়া হইয়া উদর স্ফীত হইল। আরও দুইজন ডাক্তার আসিলেন। ঔষধ প্রয়োগে স্ফীত উদর কমিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নাড়ীও বসিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে ঘর্ম্ম হইতে লাগিল। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় জীবনের আশা চলিয়া গেল। সরোজিনীর কোন শেষ ইচ্ছা আছে কিনা, আমার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজিনীর জন্য নূতন সোণার হার গড়ান হইয়াছিল, সরোজিনী তাহাই চাহিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে হার ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "রাখিয়া দাও, ছোট ভাইরা পরিবে।" এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল। তুমি কোথায় ছিলে, আমার সেই চক্ষের জল দেখিবামাত্র আসিয়া আমাকে সঙ্কেত করিলে; প্রাঙ্গনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলে, "তুমি গৃহকর্ত্তা, তুমি যদি এ সময়ে একটু দুর্ব্বলতা দেখাও, সকলে হাল ছাড়িয়া দিবে, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য করা হইবে না।" তারপর আমাকে ডাকিয়া উপাসনার ঘরে লইয়া গেলে। তাই দেখিয়া ভাই পরেশও সেখানে গিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই ছোট ছোট প্রার্থনা করিলাম। আমার মন খুব ভাল হইল। আবার কন্যার পার্শ্বে গিয়া সেবা করিতে লাগিলাম। সে দিন কতবার যে আমরা উপাসনাগৃহে গিয়াছিলাম ও কতবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা গণনা করিয়া রাখিলে ভাল হইত। লোকে চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছিল; তুমি স্থিরভাবে সব শুনিতেছিলে, কিন্তু চঞ্চল হইতেছিলে না। অবশেষে কয়েকদিন পরে সরোজিনী আরোগ্য লাভ করিলেন, আমাদের সকলেরই বিশ্বাস বাড়িল।

ইহার কয়েক দিন পরে পরেশের দ্বিতীয় সন্তান কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন সেখানে থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাই তুমি তাঁহাকে নিজ বাটীতে বাহিরের ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় কন্যাটীরও কলেরা হইল। তখন তুমি বড় কন্যাটীকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলে; নিজের শিশু সন্তানটীকে অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় সেবার ভার আপনার স্কন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম ও যত্নের পরে দুটি সন্তানই ভাল হইয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থিরভাবে এরূপ বিপদের সময় সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পার। এই সকল কার্য্য করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়া দিতে হইত না। তুমি নিজেই সমুদায় মীমাংসা করিতে, ও যাহা যাহা প্রয়োজন, করিয়া যাইতে। ভাই পরেশ এবং ভগিনী মহালক্ষ্মী এই সূত্রে চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার হইয়া গেলেন।

এ পর্য্যন্ত আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কোনও বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান করি নাই। এখন জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসারের বিবাহ উপস্থিত হইল। কন্যার জন্য পাত্র সন্ধান করিতে হইল না। সুসারকে জিজ্ঞাসা করা হইল। সুসার তোমার কাছে বৃন্দাবনের নাম লিখিয়া দিলেন। বাঁকিপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের তখন ভাল অবস্থা ছিল না। তাই কন্যা সুসারকে বাটীতে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; বৃন্দাবন শিক্ষকের কাজ করিতেন। তুমি বই অন্য কোনও মাতা নিশ্চয়ই এই বিবাহের প্রস্তাবে আপত্তি করিতেন। তুমি কুলীন বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারের কন্যা, প্রতাপাদিত্যের বংশীয় স্বামীর গৃহিণী; তুমি কিরূপে মৌলিক সদেগাপ বংশে কন্যা পাত্রস্থ করিলে? এমনও নয় যে বর ধনী বা বিলাত ফেরত। ধনহীন বা অল্পজ্ঞান সম্পন্ন বলিয়া সে পাত্রকে তুমি তুচ্ছ করিলে না। বিধাতার ইচ্ছা জানিয়াই তুমি এ বিবাহ দিয়াছিলে। ভবিষ্যৎ ফল * দেখিয়া লোকে বলে, যে এ বিবাহে বিধাতার ইচ্ছা বুঝা হয় নাই; তুমি ও আমি উভয়েই বুঝিতে ভুল করিয়াছি। দেখি, তুমি আমাকে চেন, আমিও তোমাকে

* বিবাহের পর স্বর্গীয়া সুসারবাসিনীর জীবিতাবস্থায়ই তাঁহার স্বামী হিন্দুসমাজে গিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাঃ মঃ সঃ।

চিনি। এ বিষয়ে তুমিও ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলে, আমিও তাহাই করিয়াছিলাম। ফলাফল তাহারি হাতে ছিল, এখনও বলি, তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

২৭শে মে, ১৮৮৪, সুসারের বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্বে যখন সব আয়োজন হইতেছিল, তখন দেখিতাম, সমস্ত দিন তুমি দাসীর মত পরিশ্রম করিতে; আবার রাত্রে কিম্বা প্রাতঃকালে সর্ব্বাগ্রে উপাসনার স্থানে আসিতে। মেরী-প্রকৃতি ও মার্থা-প্রকৃতি * যেন তোমাতে মিশ্রিত হইয়াছিল। বিবাহের লুচি তুমি নিজে ভাজিয়াছিলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় শরীরের শ্রান্তিবশতঃ তোমার নিদ্রা আকর্ষণ হইল। তুমি একজন মহিলাকে বলিলে, 'দিদি, ৫ মিনিট নিদ্রা যাই।' এই বলিয়া অঞ্চল বিস্তৃত করিয়া উনুনের পার্শ্বেই শয়ন করিলে। অল্পক্ষণ পরেই জাগরিত হইলে, এবং বলিলে, 'আঃ বাঁচিলাম।' আবার পূর্ব্বের মত কায করিতে লাগিলে।

বিবাহের পর স্ত্রী আচারের দিনে তুমি কি করিলে? অন্য কোনও বস্ত্র কিংবা দানসামগ্রী না দিয়া তুমি বর কন্যাকে গেরুয়া ও একতন্ত্রী দিয়া সাজাইলে। কারণ, গেরুয়াই তোমার চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বস্ত্র, ও একতন্ত্রী তোমার বিচারে সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বাদ্য যন্ত্র। তাহার পর আশীর্ব্বাদ করিবার সময় পুরস্ত্রীরা একত্রিত হইলে সকলের সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া তুমি বর কন্যার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলে। বৈরাগ্য এবং প্রার্থনা ভিন্ন কোনও কাজ তোমার হইত না, বিবাহও হইল না। এরূপ প্রার্থনায় কাহারও কাহারও আপত্তি হইয়াছিল। তাঁহাদের মতে তখন প্রার্থনা করিবার সময় নহে। কিন্তু যখন কর্ত্তব্য মনে হইত, তুমি কাহারও কথা গ্রাহ্য করিতে না। যখন সামাজিক উপাসনায় আচার্য্য বলিতেন, "আমরা দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি," তখন কোন নারীই উঠিতেন না; কিন্তু তুমি আপনাকে সমাজের একজন লোক মনে করিতে, এবং প্রত্যেক সামাজিক উপাসনায় সাধারণ প্রার্থনার সময় পুরুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে। এজন্যও তোমাকে অনেক নিন্দা ও ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল।

ইহার পরে বাঁকিপুর নয়াটোলাতে আমাদের নিজের বাড়ী হইল। তুমি গৃহ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান করিলে। গৃহের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঘরটীকে ঠাকুর ঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলে। যতদিন পৃথক দেবালয় প্রস্তুত না হইল, ততদিন ঐ উপরের ঘরেই উপাসনা হইত। শয়নের একটু কষ্ট হইত, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করিতে না। এখানে আসার পর হইতে পল্লীস্থ সমুদয় ব্রাহ্ম পরিবার গুলির বিশেষ ভার তোমার উপর পড়িল। সকলের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক অভাবের খোঁজ লইতে। প্রচার আশ্রমের সংবাদও তুমি লইতে। তাঁহারা বলিতেন না, সুতরাং নিজেই তাঁহাদের ভাণ্ডারে গিয়া দেখিতে, কিসের অভাব আছে। যাহা জানিতে পারিতে, আমার কাছে বলিতে, ও আপনার ভাণ্ডার হইতে অনেক সময়ে প্রয়োজনীয় বস্তু প্রেরণ করিতে। প্রয়োজন মত প্রতিবেশীদিগকেও আপনার ভাণ্ডার হইতে বস্তু যোগাইতে। তাঁহারা প্রত্যর্পণ করিলেও আনন্দে গ্রহণ করিতে, কিন্তু নিজে চাহিতে না, অথবা নিজের অভাব হইলে কাহাকেও জানিতে দিতে না।

এই সময়ে একদিন আমি অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া সংসারের মাসিক আয় ব্যয়ের এষ্টিমেট্ প্রস্তুত করিতেছিলাম। আমার শ্রম দেখিয়া তুমি বলিলে, "আমাকে এ কাজ দিয়া কি বিশ্বাস করিতে পার না?" আমি বলিলাম, "পারি, কিন্তু পাছে গোলমাল হয় তাই তোমাকে এতদিন দিই নাই।" অতঃপর সমুদয় অর্থব্যয়ের ভার তোমারই হইল। প্রথমে তুমিও লইতে ভীত হইয়াছিলে। আমি আশ্বাস দিলাম। তুমি সেই যে অর্থব্যয়ের ভার লইলে, শেষ পীড়া পর্য্যন্ত অম্লান বদনে সে ভার বহন করিয়াছিলে। একদিনের তরেও আমাকে ভাবিতে দাও নাই। আয় ব্যয়ের কোন বিশৃঙ্খলাও ঘটে নাই।

* মেরী ও মার্থা বাইবেলবর্ণিত দুইটী নারী। ইহারা দুই ভগ্নী যীশুর শিষ্যা ছিলেন। মেরী চিন্তাশীলা ও নীরবসাধনপরায়ণা এবং মার্থা কর্ম্মব্যস্ততার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভাঃ মঃ সঃ।

অনাটন পড়িলে আমাকে কোনও দিন বিরক্ত করিতে না, কিম্বা প্রাণান্তেও বাজার হইতে ধারে দ্রব্যাদি আনিতে না। ইহাতে এই শিখিলাম, নারীকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিয়া বিশ্বাস করিলে তিনি সে বিশ্বাসের উপযুক্ত হইতে পারেন। সংসারের কঠিন দুর্ভাবনা হইতে আমাকে মুক্তি দিবার জন্য তুমি এই ভার আপনি লইলে। যখনই আমাকে রাজকীয় কার্য্যভারে অধিক প্রপীড়িত দেখিতে, প্রায়ই বলিতে, কবে আমার সেই ক্ষমতা হইবে, যখন এ সকল বিষয়েও তোমাকে আমি সাহায্য করিতে পারিব।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহাসমিতি—গত ডিসেম্বর মাসে কাশী-ধামে জাতীয় মহাসমিতির একবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। পুনানিবাসী মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোখলে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থত্যাগ, শিক্ষা ও প্রতিভাবলে ইনিই আমাদের স্বদেশসেবক দলের শীর্ষস্থানীয়। ভবিষ্যতে ইঁহার জীবন-কাহিনী আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা আছে। ইঁহার নেতৃত্বাধীনে এই বৎসর মহাসমিতির কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় দশ হাজার পুরুষ ও মহিলা এবার মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতির বক্তৃতা অত্যন্ত পাণ্ডিত্য, উদ্দীপনা এবং চিন্তাপূর্ণ হইয়াছিল। ভারতের সকল প্রদেশের নেতৃবর্গই মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ভারতীয় সমাজ সংস্কার-সমিতি—বোম্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ পরলোকগত মহামতি রাণাডে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে আমাদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি না হইলে আর কোন উন্নতি সম্ভবপর নয়। এজন্য জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এই সমিতি স্থাপন করেন। বর্ত্তমান সময়ে বোম্বাই হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রবরকার ইহার সম্পাদক। গত ৩০শে ডিসেম্বর জাতীয় মহাসমিতির মণ্ডপে এই সমিতির একবিংশ অধিবেশন হইয়াছিল। সিভিলিয়ান পণ্ডিত জোয়ালপ্রসাদ শঙ্খধর এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমিতিতে স্ত্রীশিক্ষা, অবরোধ-প্রথা, সামাজিক পবিত্রতা, বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। শ্রীমতী রমনভাই মহিপাত্রম্ ইংরাজী ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব উথাপন করেন। জলন্ধর নিবাসিনী শ্রীমতী শাস্ত্রী দেবী হিন্দি ভাষায় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। "ভারতী" সম্পাদিকা লাহোরবাসিনী শ্রীমতী সরলা দত্তচৌধুরী (ভূতপূর্ব্ব সরলা দেবী) ও পুনা অনাথাশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমতী তারাবাই ওয়ানবে ইংরেজী ভাষায় এই প্রস্তাবের পোষকতা করেন। কয়েকজন পুরুষও এবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ভূতপূর্ব্ব অন্তঃপুর সম্পাদিকা, শ্রীহট্টবাসিনী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী হিন্দি ভাষায় অবরোধ প্রথার কঠোরতা দূরীকরণ বিষয়ক প্রস্তাব উথাপন করেন। সভাপতি মহাশয়ের সুশিক্ষিতা পত্নী ও অপর কয়েকজন বক্তা প্রস্তাবের পোষকতা করেন।

সমিতির কার্য্যে এই বৎসর মহিলাগণ যেরূপ যোগ দিয়াছিলেন তাহা বিশেষ আশাপ্রদ।

ভারত-মহিলা পরিষদ—গত বৎসর জাতীয় মহা-সমিতির বিংশতি অধিবেশন উপলক্ষে বোম্বাই নগরে মহিলাগণের এক সম্মিলনী হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মহিলাগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ও সকলের সমবেত শক্তি দ্বারা নারী জাতির ও দেশের কল্যাণ সাধনই এই সমিতির উদ্দেশ্য। এ বৎসর যুক্ত প্রদেশ-নিবাসিনী শ্রীমতী রামদুলারি দোবে ও শ্রীমতী সুশীলা টহলরামের আহ্বানে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন উপলক্ষে এই পরিষদেরও অধিবেশন হইয়াছিল। আগামী বারে আমরা "ভারত মহিলা-পরিষদের" অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

১ম ভাগ। } ফাল্গুন, ১৩১২। { ৭ম সংখ্যা।

নারীর সখিত্ব।

পতি-পত্নীর সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।"

অর্থাৎ "পত্নী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবেন, পতির নিকটে সর্ব্বদা স্বচ্ছ থাকিবেন, এবং সর্ব্বপ্রকার হিতকার্য্যে পতির সখী হইবেন।" ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইবেন অর্থাৎ যেখানেই পতি সেইখানেই পত্নী, এই নিয়ম থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ—স্বচ্ছতা প্রকৃত বন্ধুতার প্রধান উপাদান, সুতরাং তাহা থাকিবে। তৃতীয়তঃ—সংসারের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালনে ও পরোপকার-ধর্ম্মে নারী পতির সখী বা পরামর্শদায়িনী থাকিবেন।

এখানে শাস্ত্রকার মানবপ্রকৃতি বিষয়ে নিজের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। নারীর সখিত্ব যে কেবল নারীর জন্যই প্রয়োজনীয় তাহা নহে, পুরুষের পক্ষেও তাহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। নারী হইতে বিযুক্ত থাকা বা দূরে থাকা পুরুষের পক্ষেও শ্রেয়স্কর নহে; অথবা নারীর পরামর্শবিহীন হইয়া কাজ করা পুরুষের পক্ষেও নিরাপদ নহে। নারী-প্রকৃতির গূঢ়তত্ত্ব যাঁহারা জানিয়াছেন তাঁহারা জানেন, যে পুরুষে ও নারীতে এই এক মহা প্রভেদ যে পুরুষ অনেক চিন্তা ও বিচারের পর যে আধ্যাত্মিক বা নৈতিক সত্যে উপনীত হন, নারী অনেক সময়ে স্বাভাবিক ভাবে, বিনা আয়াসে, সোজাসুজি সেই সকল সত্য দর্শন করিয়া থাকেন। পুরুষ যখন বিচারের পথে বিলম্ব করিতেছে, নারী তখন হয় ত সাক্ষাৎ দর্শনের দ্বারা দেখিতেছেন। নারীর এই সাক্ষাৎদর্শনের শক্তি থাকাতে তিনি পরামর্শদায়িনীর কার্য্য উত্তমরূপে করিতে পারেন। যেমন দাবা খেলাতে যে ব্যক্তি খেলে তদপেক্ষা যে ব্যক্তি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া খেলা দেখে সে অনেক সময়ে প্রকৃত চাল দেখিতে পায়, তেমনি পুরুষ যে ক্ষেত্রে কাজ করিতেছেন সে ক্ষেত্রে নারী পরামর্শদায়িনী রূপে থাকিলে সে কার্য্যে নীতি ও আধ্যাত্মিকতা সুরক্ষিত হইয়া থাকে। সংসারের শতপ্রকার বিক্ষোভকারী কারণের মধ্যে যে আপনাকে হারায় না, সেই সংসারের আপদ বিপদে পরামর্শ দিবার উপযুক্ত। নারীপ্রকৃতি

স্থৈর্য্য ও আত্মসংযম গুণে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং নারী পরামর্শ-দায়িনী হইবার পক্ষে এবং সুনীতি ও আধ্যাত্মিকতার মর্য্যাদা রক্ষার পক্ষে সুদক্ষ।

কেবল যে পতি-পত্নীর সম্বন্ধেই এই নিয়ম তাহা নহে। সামাজিক ভাবে বলিতে গেলে পুরুষ-সমাজ যদি নারী-সমাজকে অবজ্ঞার তলে পশ্চাতে না ফেলিয়া আপনাদের পরামর্শের ভিতরে তাহাদিগকে গ্রহণ করেন তাহা হইলে সমাজের সকল কার্য্যে সুনীতি ও আধ্যাত্মিকতা রক্ষিত হইতে পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নারীদিগকে জন-সমাজের কার্য্যের উপরে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে দিলে তদ্দ্বারা জনসমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে। জনসমাজের ইতিবৃত্তেও তাহা দৃষ্ট হইতেছে। প্রতীচ্য জগতে নারীগণ কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন; সুতরাং সেখানে পুরুষ সমাজের গতিবিধির উপরে নারীগণের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে খাটিয়া থাকে। সে সকল দেশে আমরা দেখিতেছি, যেখানেই নারীগণ পুরুষ-সমাজের উপরে স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে পাইতেছেন, সেই খানেই সেই শক্তি সুনীতি রক্ষার দিকে নিয়োজিত হইতেছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

প্রায় একত্রিশ কি বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ আন্দোলন 'নারীগণের সুরাবিদ্রোহ' ("Women's Brandy War") নামে উক্ত হইয়াছে। সেই ব্যাপারটী এই:—ঐ প্রদেশের পুরুষদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর পুরুষদিগের মধ্যে পানাসক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যে ঘরে ঘরে নারীগণের দুঃখ ক্লেশ অসহ্য হইয়া উঠিল। এই অবস্থাতে কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কিরূপে পুরুষ-দিগের পানাসক্তি সংযত করা যায়। এই ভাব নারীকুলের মধ্যে এরূপ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, যে তাড়িৎ-শক্তির ন্যায় ইহা এককালে বহুসংখ্যক নারীর হৃদয়ে কার্য্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নানাদিক হইতে দলে দলে রমণী একত্র হইতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপেই হউক পুরুষদিগের পানাসক্তিকে সংযত করিবেন। তৎপরে তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হউক আর না হউক, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট মৌলিকত্ব ছিল এবং তাহা চিরদিন স্মরণীয়। তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে একটী প্রকাণ্ড দলে দলবদ্ধ হইয়া, সেই দলকে ৫০।৬০ জনের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিলেন। স্থির হইল যে তাঁহারা অনুরোধ, উপরোধ, প্ররোচনা ও দ্বার অবরোধ প্রভৃতি দ্বারা শুঁড়ি-দিগকে বাধ্য করিয়া তাহাদের দোকান বন্ধ করিবেন। তৎপরে যে প্রণালীতে কার্য্য চলিল তাহা এই:—একদিন প্রাতঃকালে সহরের একজন শুঁড়ি মহিলা-সমিতির সম্পাদিকার নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র পাইল—"তোমাকে সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে এই পত্র প্রাপ্তির এত ঘণ্টার মধ্যে তোমার দোকান বন্ধ করিবে। যদি না কর, তৎপরে আমরা তোমার দোকান আক্রমণ করিব, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিবে।"

অনেক স্থলে এরূপ ঘটিল, যে শুঁড়ি পত্র পাইয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মনে করিল নারীদের এই প্রকার বাতুলতার প্রতি কর্ণপাত করা উচিত নয়। তৎপরে দেখ! নিয়মিত সময়ের পর ৫০।৬০ জন মহিলার এক সৈন্য-দল গান করিতে করিতে শুঁড়ির দোকানের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত! তাঁহারা দ্বার যুড়িয়া বসিয়া ক্রমাগত সঙ্গীত ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কোনও সুরাপায়ী সেই মহিলাদল ভেদ করিয়া সেই সুরামন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় না। কাজেই শুঁড়ির সুরা বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। ইঁহারা দুই ঘণ্টা গান ও প্রার্থনা করিলেন; তৎপরে আর এক দল আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বদল আহার পান ও গৃহ-কার্য্যাদির জন্য গমন করিলেন। আবার ২।৩ ঘণ্টা পরে আর এক দল আসিয়া উপস্থিত। এইরূপ দিনের পর দিন চলিল; যতক্ষণ না শুঁড়ি 'সুরাসক্ত পুরুষদিগকে সুরা দান করিব না' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিল, ততক্ষণ মহিলারা তাহার দ্বার ছাড়িলেন না। এইরূপে এক এক

সহরে এক এক দিন ৮।১০টী করিয়া দোকান বন্ধ হইতে লাগিল।

এই 'নারীগণের সুরা বিদ্রোহ' দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা হইতে তিনটী উৎকৃষ্ট ফল ফলিল। প্রথম—যুক্তরাজ্যের অনেক প্রদেশে এই নূতন আইন প্রচলিত হইল, যে যদি কোন শুঁড়ি কোন পুরুষকে তৎপূর্বেই সুরাদ্বারা উত্তেজিত দেখিয়াও তাহাকে সুরা দেয় তাহা হইলে ঐ পুরুষের পত্নী সেই শুঁড়ির নামে অভিযোগ করিতে পারেন। নারীদিগকে এই প্রকার অধিকার দেওয়ার পর বহুসংখ্যক শুঁড়ির অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড হইয়াছে। দ্বিতীয়—State of Maineএর ন্যায় কোন কোন প্রদেশে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, যে অপরাপর বিষাক্ত দ্রব্যের ন্যায় চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতীত ও লাইসেন্স ব্যতীত কেহ সুরা বিক্রয় করিতে পারিবে না। তৃতীয় ইষ্ট ফল এই হইয়াছে, যে নারী দিগের সেই দল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ভুবনব্যাপী এক মহা নারী-সভাতে পরিণত হইয়াছে। তাহার নাম "Woman's Christian Temperance Union"—ইহার সভ্যসংখ্যা লক্ষেরও অধিক। কুমারী উইলার্ড নাম্নী এক বিদুষী নরহিতৈষিণী রমণী ইহার প্রধান অধিনেত্রী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই মহাসভা ইঁহার প্রতিভা ও অপূর্ব্ব কার্য্যকারিণী শক্তির এক অপূর্ব্ব নিদর্শন।

মার্কিন রমণীদিগের উদ্যমশীলতা প্রমাণ করিয়াছে, যে মানব-সমাজের কার্য্যকলাপে রমণীদিগকে নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে দিলে, সেই শক্তি সুনীতি রক্ষার দিকেই চালিত হয়। পাশ্চাত্য জগতের অপর অপর দেশেও যেখানে যেখানে মানব-সমাজের কার্য্যকলাপের উপর নারীগণকে হস্তার্পণ করিতে দেওয়া হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সুনীতির রক্ষার জন্য প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার ফলও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহার অপর দৃষ্টান্ত যদি কেহ চান তবে তাঁহাকে আইরিশ-দলের ভূতপূর্ব্ব নেতা পার্ণেলের বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। পার্ণেল আইরিশ-দলের অদ্বিতীয় অধিনায়ক, সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র এবং ইংলণ্ডের রাজপুরুষদিগের ভীতির পদার্থ ছিলেন। পার্ণেল যাহা ভাবিতেন তাহাই করিতেন; যাহাকে তুলিতে চাহিতেন সেই উঠিত, যাহাকে ফেলিতে চাহিতেন সেই পড়িত। যখন তাঁহার এই প্রকার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও অসীম শক্তি তখন মিসেস্ ওসী সংক্রান্ত কলঙ্কের কথা প্রকাশ পাইল। ইংলণ্ডের রমণীগণ জাতক্রোধ হইয়া পার্ণেলকে স্বীয় পদ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পার্লামেণ্ট সভার সভ্যগণের অনেকে, আইরিশ-দলের বহুসংখ্যক লোক এবং সাধারণ প্রজাবর্গেরও অনেকে পার্ণেলকে পদচ্যুত হইতে দেওয়া উচিত নয় মনে করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই, কিছুতেই, তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। নারীগণের মুষ্ট্যাঘাতে পার্ণেল স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না; থর থর কাঁপিয়া গেলেন। অবশেষে মনের ক্লেশে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া অকালে তাঁহার প্রাণ গেল।

এত গেল প্রতীচ্য জগতের কথা; আমাদের প্রাচ্য জগতেও নারীশক্তির চালনার উৎকৃষ্ট ফল কি, তাহার দৃষ্টান্ত একেবারে অপ্রাপ্য নহে। ইন্দোরের রাজ্ঞী অহল্যাবাই, নাটোরের রাজ্ঞী রাণী ভবানী, পুটীয়ার রাজ্ঞী শরৎসুন্দরী ও কাশীমবাজারের রাজ্ঞী স্বর্ণময়ী, ইঁহারা বর্ত্তমান সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বে ঐ ঐ রাজপদে পুরুষ নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা বা কিরূপ স্বভাব চরিত্রের লোক ছিলেন, এবং তাঁহাদের রাজ্যকালে লোকের কল্যাণ কিরূপ সাধিত হইয়াছিল, আর এই রাজ্ঞীগণই বা কিরূপ স্বভাব চরিত্রের লোক ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই বা রাজ্যের ও দেশের কল্যাণ কিরূপ সাধিত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কথাও উল্লেখযোগ্য। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রাজার কার্য্যকলাপের সহিত ভিক্টোরিয়ার কার্য্যকলাপের তুলনা করিলে নারী-প্রকৃতির মহত্ব কোথায় তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না।

নারীপ্রকৃতিতে স্বাভাবিক পবিত্রতা থাকাতেই

সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বসমাজে নারীর সখিত্ব পুরুষ চরিত্রের উন্নতির কারণ হইয়া থাকে। ইহারও কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি ;—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারত-বাসী ইংরাজদিগের চরিত্র অতি জঘন্য ছিল। সে কেমন একটু ভাঙ্গিয়া বলি। হেষ্টিংসের অধিকারকালে লি গ্রাণ্ড নামে একজন ফরাসি কলিকাতাতে বাস করিতেন। তিনি চন্দনগরবাসী একজন ফরাসির একটী বালিকা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বালিকা পরমা সুন্দরী ছিল। বিবাহের পর লি গ্রাণ্ড সস্ত্রীক কলিকাতা সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অমনি তাঁহার সুন্দরী ভার্য্যার প্রতি সহরের বড় বড় ইংরাজদিগের দৃষ্টি পড়িল। যে সে লোক নহে, গবর্ণর জেনেরলের মন্ত্রি-সভার অন্যতম সভ্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ঐ ষোড়শবর্ষীয়া বালিকাকে বিপথে লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই, অপর কয়েক জন বড় বড় ইংরাজ সেই ষড়যন্ত্রে প্রবেশ করিলেন। এক দিন রাত্রে লি গ্রাণ্ডের অনুপস্থিতিকালে প্রাচীরে সিঁড়ি লাগাইয়া ফিলিপ ফ্রান্সিস ম্যাডাম গ্রাণ্ডের গৃহে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। গ্রাণ্ডের ভৃত্যগণ জানিতে পারিয়া সেই গৃহ আবেষ্টন করাতে ফিলিপ ফ্রান্সিস বাঁশী বাজাইয়া সংকেত করিবামাত্র চারি পাঁচ জন বড় বড় ইংরাজ প্রাচীর টপ্‌কাইয়া সেই গৃহে আসিয়া ফ্রান্সিসকে ছাড়াইলেন ; কিন্তু ভৃত্যগণ এক জনকে ধরিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ওদিকে লি গ্রাণ্ডকে খবর দেওয়া হইল। অতঃপর লি গ্রাণ্ড সুপ্রিম কোর্টে নালিস করিলেন এবং আপনার পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন। আদালতের বিচারে ফ্রান্সিসের গুরুতর অর্থ দণ্ড হইল। ফ্রান্সিস ঐ বালিকাকে চুঁচুড়াতে লইয়া পত্নীর ন্যায় রাখিলেন। তাহাতে তাঁহার পদের বা প্রভাবের কোনও ব্যাঘাত হইল না। এস্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে এই মাদাম গ্রাণ্ড উত্তরকালে ফরাসি দেশে গিয়া নেপো-লিয়ানের সুপ্রসিদ্ধ সভাসদ মার্শাল ট্যালেরাণ্ডকে বিবাহ করিয়া মাদাম ট্যালেরাণ্ড নামে সুপরিচিত হন। সে সময়কার ইংরাজ পুরুষ-চরিত্র ব্যক্ত করিবার জন্য এত কথা ভাঙ্গিয়া লিখিলাম। বড় বড় ইংরাজের চরিত্র এইরূপ ছিল। অধিক কি, তখনকার ভারতবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে এরূপ লোকেরও উল্লেখ দেখা যায়, যাহারা এদেশীয় নবাবদিগের অনুকরণে নিজ নিজ অবরোধে দুই, চারি, দশ বা তদধিক দেশীয় স্ত্রীলোক রাখিত, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিত না। কিন্তু বাষ্পীয় যানের সৃষ্টি হইয়া ইংরাজ রমণীগণ যখন দলে দলে এদেশে পদার্পণ করিতে লাগিলেন, তখন ইংরাজ পুরুষ-দিগের চরিত্রে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। নারীদিগের প্রভাবে পূর্ব্বোক্ত সমুদয় পাপ ইংরাজ সমাজ হইতে অদর্শন হইল। এখন ভারতীয় ইংরাজসমাজ বহুল পরিমাণে উন্নত ও পবিত্র।

আর একটী দৃষ্টান্ত ইহারই অনুরূপ। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বাঙ্গালিগণ রাজকার্য্যোপলক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা পঞ্জাব প্রদেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন যাতায়াতের সুবিধা না থাকাতে অনেকে পরিবার সঙ্গে লইতে পারিতেন না। কাজেই পুরুষ-দিগকে একা একা বাস করিতে হইত। এই সময়ে পশ্চিমবাসী বাঙ্গালী পুরুষের চরিত্র অতি অপকৃষ্ট ছিল। পানাসক্তি ও অপরাপর দুষ্ক্রিয়া তাঁহাদের অধিকাংশের চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছিল। ক্রমে রেলওয়ের সৃষ্টি হওয়াতে বাঙ্গালি রমণীগণ দলে দলে ঐ সকল প্রদেশে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। অমনি পুরুষদিগের চরিত্র বদলাইতে লাগিল। এখন পশ্চিমবাসী অনেক বাঙ্গালী পুরুষের স্বভাব চরিত্র উৎকৃষ্ট। তবু যদি পাশ্চাত্য রমণী-দিগের সামাজিক স্বাধীনতার ন্যায় এদেশীয়াদিগের স্বাধীনতা থাকিত তাহা হইলে না জানি পুরুষ-চরিত্র আর ও কত উন্নত হইত।

এইরূপে দেখিতেছি পুরুষ-চরিত্রকে সুপথে রক্ষা করা নারীর এক প্রধান কাজ। ইহা দেখিয়াই একজন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন, পুরুষ হাতী ও নারী মাহুত। হাতী যেমন গোঁয়ার, নির্ব্বোধ, বলশালী, স্বেচ্ছাচারী, পুরুষ প্রকৃতি তেমনি প্রবৃত্তি-পরবশ, স্থূল, বলশালী ও যথেচ্ছাচারী ; তাহাকে সুপথে রাখিবার জন্য নারী-মাহুতের প্রয়োজন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানব সমাজের কার্য্যকলাপে নারী পুরুষের সহচরী হইলে সেই সকল কার্য্যকলাপ অনেক পরিমাণে উন্নত ও পবিত্র হইয়া চলিতে পারে। আর বিধাতার অভিপ্রায়ও সেইরূপ মনে হয়। পুরুষ ও নারী লইয়াই গৃহ পরিবার, পুরুষ ও নারী লইয়াই জন সমাজ। এমন সকল গুণ নারীতে আছে যাহা পুরুষে নাই; আবার এমন সকল গুণ পুরুষে আছে যাহা নারীতে নাই। বিধাতার ইচ্ছা এই, যে এই সকল গুণের সমবায় হইয়া জনসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ হয়। যদি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গকে হীনপ্রভ, দুর্ব্বল, অশিক্ষিত ও স্বীয় শক্তি প্রয়োগে অসমর্থ রাখা যায় তাহাতে জনসমাজেরই ক্ষতি। সেইরূপ সমাজের নৈতিক দুর্গতি অনিবার্য্য। নারীগণ যাহাতে নিজের ও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা করিতে গেলেই তাঁহাদের শিক্ষা ও সমাজিক স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করিতে হয়। সৎশিক্ষা মানবাত্মাকে উন্নত, উদার ও স্বাবলম্বনশীল করে। যাহাতে চিত্তকে উদার ও উন্নত করে এরূপ শিক্ষা কি পুরুষ কি নারী উভয়ের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু যদি তুলনাতে বিচার করিতে হয় তাহা হইলে বরং একথা বলা যায়, যে এরূপ শিক্ষা পুরুষ অপেক্ষা নারীর পক্ষে অধিক প্রয়োজন। কারণ নারীগণকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, গৃহ পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে হয়। তেলটুকু, নুনটুকু, পয়সাটী, এদিকে অমুক জিনিসটীর অপচয় ও ওদিকে দুই পয়সার ক্ষতি, এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তাতে সর্ব্বদাই চিত্তকে নিযুক্ত রাখিতে হয়। সুতরাং অনেক সময়ে অলক্ষিত ভাবে নারীচরিত্রে ক্ষুদ্রাশয়তা জন্মিবার সম্ভাবনা। এই ক্ষুদ্রাশয়তা দেখিয়াই বোধ হয়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী"—স্ত্রীলোক ঘর ভাঙ্গায়, পুরুষের মনে ক্ষুদ্রাশয়তা আনিয়া দেয় এবং সকল দিকে অনর্থ উৎপাদন করে। যেমন একদিকে এই ক্ষুদ্রাশয়তার ভয় আছে তেমনি অপর দিকে উন্নত ও উদার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে নারীগণের হৃদয় মনের উন্নতি ও বিকাশের উপযোগী বন্দোবস্ত থাকা কর্ত্তব্য। জ্ঞানের বিষয় সকল তাঁহাদের হাতের নিকট উপস্থিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

এই সকল প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই এ দেশের নারী-গণের বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ে। নারীর সখিত্বের অভাবে এদেশীয় সমাজের কি ক্ষতিই হইয়াছে! আমরা যেন মাহুতের হাতে পায়ে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া হাতীকে সচ্ছন্দে বিহার করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছি! নারীকে পুরুষের পশ্চাতে ও পুরুষ হইতে দূরে রাখিয়াছি। ইংলণ্ডে একজন বিবাহিত পুরুষ আপনার পত্নীকে সঙ্গে না লইয়া যদি পাঁচ দিন একাকী রঙ্গভূমিতে অভিনয় দেখিতে যায়, অমনি সমাজে নারীকুলের মধ্যে কাণাকাণি আরম্ভ হয়—ব্যাপারটা কি? সেখানে স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ না করিয়া পতিকে নিমন্ত্রণ করাটা অভদ্রতা, তাহাতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তির অপমান। সে দেশের নিয়ম, বৈঠক খানাতে পত্নী পতির পার্শ্বে,—নিমন্ত্রণাগারে পত্নী পতির পার্শ্বে, রঙ্গমন্দিরে পত্নী পতির পার্শ্বে, আরাম-উদ্যানে পত্নী পতির পার্শ্বে, সর্ব্বদাই মাহুত হাতীর সঙ্গে। পত্নীর ন্যায় পতি-চরিত্রের প্রহরী কে হইতে পারে? সুতরাং সেখানে বিবাহিত পুরুষদিগের চরিত্র অনেক পরিমাণে নির্দ্দোষ। ফরাসি দেশে ইহার বিপরীত কারণে বিপরীত ফল। শুনিয়াছি সেখানে নারী পুরুষের চিরসঙ্গিনী নহে; সমাজিক রীতিতে পরস্পরকে বিভিন্ন হইয়া থাকিতে দেয়। সুতরাং মাহুত বিহীন হাতীর যে দুর্দ্দশা ঘটিবার সম্ভাবনা, পুরুষের সে দুর্দ্দশা অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। বোধ হয় এই জন্যই ফরাসি-সমাজ নীতি বিষয়ে হীন।

আমাদের দেশের নারীগণের ত কথাই নাই। গৃহ মধ্যেও পুরুষ-নারীতে দেখা শুনা নাই। বঙ্গদেশে সকল গৃহস্থের গৃহেই অন্তঃপুর বহিঃপুর আছে। নারীগণ অন্তঃপুরেই আবদ্ধ; বহিঃপুরে পদার্পণ করিবার অধিকার নাই। ইহার ফল এই হইয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্তও অপ্রাপ্য নহে যে পতি বহিঃপুরে বাজারের স্ত্রীলোক, বা রঙ্গভূমির অভিনেত্রীকে আনিয়া আমোদ করিতেছেন

আর পত্নী অন্তঃপুরের ছাদ হইতে অশ্রুপ্লুত নয়নে দেখিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সমাজের অধিক শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে? পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে এরূপ নিয়ম দেখা যায়, যে তাঁহাদের বৈঠকখানা নারীদিগের অন্দর মহল হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বাড়ীতে; হয় ত দশ পনর রসি পথের ব্যবধানে। পুরুষগণ দিবসের অধিকাংশ কাল, ও রজনীর চারি পাঁচ ঘণ্টা সেই বৈঠকখানাতে ইয়ার বক্‌সিগণের সহিত বাস করেন, হয় ত দুইবার আহারের সময় নারীমহলে পদার্পণ করিয়া থাকেন, এবং রাত্রে নিদ্রা যাইবার জন্য সেই মহলে আসিয়া থাকেন। এদিকে নারীগণ বিবাদ কলহে, পরনিন্দাতে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের চর্চ্চাতে কাল কাটাইতে থাকেন। এরূপ সামাজিক ব্যবস্থার অনিষ্ট ফল কি, তাহা আর বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা এই, গার্হস্থ্য ও সামাজিক কার্য্যে পুরুষ ও নারীর সাহচর্য্য সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয়, এবং সামাজিক ব্যবস্থাও তদনুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য।

তৎপরে আর একটী গূঢ়রূপে বিচার্য্য কথা আছে:—এতদ্দেশে যে প্রকার সামাজিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই গৃহধর্ম্ম প্রধানতঃ পুরুষেরই সুখের জন্য। পুরুষ সেখানে রাজা। পুরুষের সুখের চিন্তা অগ্রে, তৎপরে অপরের সুখের চিন্তা। পুরুষ যাহা চান তাহা অগ্রে যোগাইতে হইবে, নারী সে বিষয়ে পরিচারিকা মাত্র। এতদ্দেশে পুরুষ হাতী ও নারী মাহুত না বলিয়া, পুরুষ বানর ও নারী বানরী বলিলে হয়। বানরের দলে দেখিতে পাই, এক একটী বানরের সঙ্গে অনেক বানরী থাকে এবং তাহারা তার সুখের জন্যই থাকে, তেমনি এদেশে অনেক সময় এক এক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারী থাকে এবং তাহারা তাহার সুখের জন্যই থাকে। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা থাকিতে সামাজিক সুনীতি সম্পূর্ণ রক্ষিত হইবে না। ইহার বিপরীতে এই ভাব যতই দেশে ব্যাপ্ত হইবে, যে গৃহধর্ম্ম প্রধানতঃ রমণীর জন্য; রমণীকে সুখী করা, রমণীর জীবনের উন্নতি সাধনে সহায়তা করা এবং সেই উন্নতি সাধনের অবসর ও অধিকার দেওয়া গৃহধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য, ততই সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

ভারত-নারীকে এই অবস্থাতে উন্নত করিতে এখনও বহুকাল লাগিবে। কিন্তু দেশহিতৈষী ও সমাজ-সংস্কারকগণের দৃষ্টি এই দিকে থাকা উচিত। নারীর অবস্থার উন্নতি বিষয়ে যিনি যত সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন সমুদয় এই মূল ভাবের মধ্যে নিহিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্বদেশ-প্রেমিকের দৃষ্টি স্বদেশের অবস্থার প্রতি পড়িয়াছে। তাঁহারা দেশকে নূতন পথে, নূতন ব্রতে লইতে চাহিতেছেন। তাঁহারা যেমন অনুভব করিতেছেন যে স্বদেশকে রাজনীতি বিষয়ে উন্নত করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য বন্ধন চাই, কারণ হিন্দু যাহা চায় মুশলমান তাহার বিরোধী,—যত দিন এরূপ থাকিবে তত দিন আমাদের স্বায়ত্ব-শাসনের সুখ লাভ করা সুদূর-পরাহত। তেমনই সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অনুভব করা আবশ্যক, যে দেশকে উন্নতির পথে দণ্ডায়মান করিতে হইলে আরো দুইটী বিষয়ের প্রতি প্রণিধান করিতে হইবে। প্রথম—প্রজা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাহাদের উন্নতি। দ্বিতীয়তঃ নারীকুলের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাঁহাদের উন্নতি। দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এই, যে দেশের তেত্রিশ কোটী অধিবাসীর সঙ্গে তুলনা করিলে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মুষ্টিমেয় বলিলে হয়। আবার পাশ্চাত্য শিক্ষা নিবন্ধন প্রজাবর্গের প্রাচীন সমভাবুকতা (homogeneity) বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে। এই কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির নব ভাব ও নব আকাঙ্ক্ষা সমাজের তলদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। প্রজা সাধারণের ও নারীকুলের নিকট গিয়াই তাহার প্রসার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। অতএব আমাদের দশা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যাহার মেরুদণ্ডের অর্দ্ধভাগ ভগ্ন হওয়াতে মস্তিষ্কের প্রেরণা সকল দেহের নিয়ার্দ্ধে পৌঁছিতে পারে না। এরূপ দেহ লইয়া কতদূর কার্য্য হওয়া সম্ভব তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। এই কারণে বলি,

নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে উদাসীন হওয়া দেশহিতৈষীগণের পক্ষে কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে।

জগদীশ্বর পুরুষদিগকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া জনসমাজকে উন্নত ও পবিত্র করিবার ভার নারীদিগের প্রতি দিয়াছেন। এই জন্যই তিনি পুরুষ ও নারীকে সখিত্ব-ডোরে বাঁধিয়াছেন। তাঁহারা নিজে যে পরিমাণে শিক্ষিত ও উন্নত হইবেন সেই পরিমাণে সে কাজ উৎকৃষ্টতররূপে করিতে পারিবেন। এই জন্যই তাঁহাদের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি এত জোর দিতেছি। মাহুত যদি হাতীকে খানায় ফেলে তবে তাহাকে কে বাঁচাইতে পারে? নারী যদি পুরুষকে উন্নত করিবার ভার না লইয়া তাহাকে অধঃপতিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে সে সমাজের কল্যাণ নাই।

ফল কথা এই, ভারত-নারীকে বর্ত্তমান অবজ্ঞার তল হইতে তুলিয়া তাঁহার প্রাপ্য সম্মান ও প্রতিষ্ঠাতে তাঁহাকে স্থাপন করিতে না পারিলে, গলিত কুষ্ঠের ন্যায় যে বিবিধ প্রকার সামাজিক ব্যাধি আমাদিগকে হীন ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিতেছে তাহা দূর হইবে না। শিক্ষা ও স্বাধীনতার গুণে নারী হৃদয়ে যতই আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইবে ততই গৃহ পরিবার ও সমাজের হাওয়া বদলাইয়া যাইবে; ততই নারীর সখিত্বের সুমিষ্ট ফল লাভ করিয়া সমাজ সুস্থ, সুখী ও উন্নত হইবে।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী।

সুমিত্রা।

মহারাজা দশরথের অন্তঃপুর নানা বিকচ কুসুমে পরিশোভিত ছিল। ধর্ম্মিষ্ঠা মহারাণী কৌশল্যা দেবী সেই রমণীয় উদ্যানের শ্রেষ্ঠ ও পরম মনোহর কমল পুষ্প-স্বরূপিনী ও অসীম লাবণ্যবতী কৈকেয়ী কন্টকাবৃত গোলাপ-তুল্যা; তাহার তেজোময় সৌন্দর্য্যে দশরথ বৃদ্ধ-কালে মোহান্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। আর একটি ক্ষুদ্র সৌরভময়ী যুথিকাসদৃশী শুদ্ধচরিত্রা কামিনী তাঁহার অন্তঃপুরে বিরাজিতা ছিলেন। তাঁহার মৃদু মধুর সুবাস অলক্ষ্যে অলক্ষ্যে অযোধ্যা রাজ্য সুবাসিত করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি অসাধারণ গুণবতী মহিষী সুমিত্রা। মহর্ষি বাল্মিকী ইঁহার চরিত্র একাধারে স্ত্রী-জনোচিত নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত চিত্রে অঙ্কিত করিয়া মানবচক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন।

রামায়ণের প্রথম দুই কাণ্ড অর্থাৎ আদি ও অযোধ্যা, সুমিত্রা দেবীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। তাঁহার পবিত্র চরিত্রে ধর্ম্মপরায়ণতা ও কর্ত্তব্যানুরাগ যেমন অখণ্ডভাবে লক্ষিত হয় তদ্রূপ সুশীলতা ও বিনয় উক্ত গুণাবলির অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া যেন মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

সুমিত্রা দেবী রাজা দশরথের তৃতীয়া পত্নী ও লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের গুণবতী জননী। রমণী-জীবনে সকল সুখ সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা স্বামীর প্রেম। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, সংসারে যাহা পরম বাঞ্ছনীয় তাহাই বিরল। সুচরিত, পরম পণ্ডিত, দৃঢ়ব্রত, প্রজাপ্রিয়, সুন্দর, সৌম্যমূর্ত্তি এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও সুমিত্রা পতিপ্রেমে অপূর্ণা ছিলেন। কৌশল্যা দেবীরও সেই মনস্তাপে সংসারে অনাসক্তি জন্মিয়াছিল, এবং তজ্জন্য তিনি অধ্যাত্মব্রতধারিণী হইয়া বাস করিতেছিলেন।

কিন্তু নির্ম্মলচিত্তা সুমিত্রা তাহাতেও নিরপেক্ষ থাকিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পরম যত্নবতী ছিলেন। স্বামীর তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্যভাব সত্ত্বেও তিনি তৎপ্রতি প্রগাঢ় প্রণয়বতী ছিলেন। সপত্নী-বিদ্বেষ-বহ্নিতে অযোধ্যাপুরী দগ্ধ হইয়া রাম বনবাসের সৃষ্টি হইলে, সেই ঘোর বিষাদময় বিদায়-কালীন দৃশ্যে রাজ্যময় অসহ্য করুণ ক্রন্দনরোল উত্থিত হইয়াছিল; সেই সময়েও ধৈর্য্যবতী, শান্তা, ধীমতী সুমিত্রা লক্ষ্মণের শিরঃঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, "পুত্র! তুমি রামের অত্যন্ত অনুরক্ত, অতএব আমি তোমাকে বনবাসার্থ অনুমতি দান করিলাম। হে নিষ্পাপ! তুমি ঐ বনগামী ভ্রাতার সেবায় অমনোযোগী হইও না, কেন না ইহলোকে জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই পরম ধর্ম্ম, ইহা সাধুগণ কহিয়াছেন। ভ্রাতা সমৃদ্ধিশালী হউন অথবা বিপদগ্রস্তই

হউন, উনিই তোমার গতি। এই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের দান, যজ্ঞ, দীক্ষা-গ্রহণ ও যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন, এ সমস্ত বংশ পরম্পরাগত অবশ্যকর্ত্তব্য চিরন্তন সমাচার, তুমি তদনুবর্ত্তী হইতে যত্নবান হও। পুত্র! রামকে দশরথ-তুল্য, জনক-দুহিতা সীতাকে আমার তুল্য এবং অরণ্যকে অযোধ্যা-তুল্য জ্ঞান করিবে।" আহা, সন্তানের প্রতি মাতার কি সুন্দর শিক্ষা! উর্ব্বরা ভূমির বলে বসুন্ধরা শস্যশালিনী, আর জ্ঞানবতী বিদুষী জননীর গুণে বীর, ধার্ম্মিক পুত্রের জন্ম। কবি ঐ এক চিত্রে সকল রং ফলাইয়াছেন। যেন বর্ষাসিক্ত নভোমণ্ডলে সূর্য্য-কিরণ বিভাসিত রামধনু।

মহাহর্ষময়ী অযোধ্যানগরী যখন রামাভিষেক-উৎসবে ফুল্ল কুসুমবৎ হাসিতেছিল, একবার সেই সময়ের কথা স্মরণ করুন, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার বিভিন্ন মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। একজন পতিপ্রেমে গর্ব্বিতা হইয়া সপত্নী-পুত্রের সর্ব্বনাশের ষড়যন্ত্র করিতেছেন, আর ঠিক সেই সময়েই সুমিত্রা, পরমানন্দভরে সোদরা-তুল্যা কৌশল্যা-ভবনে রামচন্দ্রের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃতা আছেন। রাম রাজা হইবেন আর তাঁহার পুত্র সেবক সহচর হইয়া জ্যেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিবেন ইহাই তাঁহার অন্তরের সুখ। অকপটে, অবিষাদে সপত্নী-সুখে সুখী হইবার এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। কি স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত চিত্র! এই সকল অসামান্য গুণ প্রাচীন কালের নারীগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়াই তাঁহারা দেবী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

সুমিত্রা নিজগুণে সর্ব্বত্র পূজ্যা ছিলেন। রামচন্দ্র স্বীয় মাতা ও লক্ষ্মণ-জননীকে সমভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন।

জননীর সুশিক্ষায় লক্ষ্মণ যেমন রামানুরক্ত, শত্রুঘ্ন ও তদনুরূপ ভরতভক্ত ছিলেন। তাঁহারা নিজত্ব ভুলিয়া ভালবাসিতে জানিতেন। ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্মের লক্ষণ!

রামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনে নির্ব্বাসিত হইলেন— পিতৃসত্য পালনার্থ; আর লক্ষ্মণের মাতা নিজের প্রাণধন সুযোগ্য পুত্রকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া ভীষণ অরণ্যে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে পরম ধৈর্য্যবতী হইয়া, আপন মনস্তাপ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় মরমের তলে ঢাকিয়া, মুমূর্ষপ্রাণ রাজা দশরথ ও ক্ষিপ্তমহিষী কৌশল্যা দেবীকে পরম হিতজনক বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সুমিত্রা কহিলেন, "সূর্য্য হইতে সূর্য্য, অগ্নি হইতে অগ্নি, প্রভু হইতে প্রভু, শ্রী হইতে শ্রী, কীর্ত্তি হইতে কীর্ত্তি, পৃথিবী হইতে পৃথিবী, দেবতা হইতে দেবতা, প্রাণী হইতে প্রাণী শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু নগরেই হউক আর বনেই হউক, রাম হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না।" এই প্রকার নানা শান্তিপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে কৌশল্যার কাতর হৃদয়ের শোকাবেগ প্রশমিত করিলেন।

তিনি সর্ব্বত্র স্বীয় কর্ত্তব্যের দ্বারা পরিচালিতা হইতেন, সুখ বা দুঃখে উত্তেজিত হইতেন না। তাঁহার অচল অটল জ্ঞান, যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে সমভাবে তাঁহাকে পথ দেখাইয়াছে।

সুমিত্রা সপত্নীগণের প্রতি চির সৌহার্দ্দময়ী ছিলেন। চিরদিন সখিত্ব, শিষ্টাচরণ ও আনুগত্য দ্বারায় উভয় সতীনের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যৎকালে মহারাজ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞান্তে মহিষীগণের মধ্যে পায়স বিতরণ করেন, তৎকালে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে দুই অংশ দিয়া অপর দুই অংশ স্বেচ্ছাক্রমে, অকুণ্ঠিত ভাবে সুমিত্রাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

সুমিত্রা-চরিত্র আদর্শভাবে আমাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসরণ করিলে আর বিদেশীয় উদাহরণ অন্বেষণ করিতে হইবে না। আমাদের ভারতবর্ষের গভীর ভাণ্ডারে বিস্তর মহামূল্য রত্ন নিহিত আছে।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

ব্রহ্মাণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

জ্যোতিষ-চর্চ্চায় আধুনিক আবিষ্কার সমূহের প্রভাব।

কোপার্নিকাসের সময় অবধি যে সকল উন্নতির কথা উল্লেখ করা হইল, ইহাদের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়ে জানিবার পক্ষে কি কি রূপ সুবিধা হইয়াছে, তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমতঃ সূর্য্য স্থির, এবং তাহার চারিধারে গ্রহগণ ঘুরিতেছে,—এ কথা জানাতে কি লাভ হইয়াছে? ইহা দ্বারা বিশেষ লাভ এই হইয়াছে যে গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব, আর, সূর্য্য, গ্রহ এবং উপগ্রহগণের পরস্পরের যথার্থ সম্বন্ধ আমরা পরিষ্কার বুঝিয়াছি।

সৌরকেন্দ্রিক (Helis-centric) মত।

মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার হওয়াতে এই সকল সম্বন্ধের কারণ আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়াছে। একটি জ্যোতিষ্কে আকাশে ভ্রমণ করিতে দেখিলেই, আমরা বলিয়া দিতে পারি যে, উহা কি উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া চলিয়াছে, না অন্য কাহাকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে। যদি এমন হয় যে সে কাহাকেও প্রদক্ষিণ করিতেছে, তবে সে জিনিসটি কোন্ স্থানে, কত দূরে, আর কত বড়? এবং যে প্রদক্ষিণ করিতেছে সে-ই বা কত বড়, ইত্যাদি সকল প্রশ্নেরই উত্তর আমরা দিতে পারি। শুধু তাহাই নহে। এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যে চক্ষুর প্রায় অদৃশ্য একটি অতিশয় ক্ষুদ্র তারাকে ক্রমাগত কয়েক দিন দেখিয়াই পণ্ডিতেরা জানিতে পারিয়াছেন যে উহা একটি নূতন গ্রহ; সূর্য্য হইতে এত দূরে থাকিয়া এইরূপ গতিতে, এইরূপ পথে তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।

মাধ্যাকর্ষণ।

এখানেও শেষ হয় নাই। এই নূতন গ্রহের কার্য্যকলাপের সহিত পণ্ডিতদিগের গণিত হিসাবের কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দেখিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন যে এত দূরে অমুকস্থানে নিশ্চয় আর একটা অজ্ঞাত গ্রহ আছে। সে টানিয়া এই নূতন গ্রহকে বিচলিত করিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া সেই অজ্ঞাত গ্রহটাকেও নির্দ্দিষ্ট স্থানের অতি নিকটেই পাওয়া গেল। ইউরেনাস্ এবং নেপচুন্ নামক গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন কোপার্নিকাসের মত এবং মাধ্যাকর্ষণবাদ অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইল, অপরদিকে তেমনি নক্ষত্রগণের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাদের সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের ভ্রাতৃত্বস্থাপনের পথ পরিষ্কার হইল। এ সকল বিষয়ে দূরবীক্ষণ অনেক পরিমাণে সহায়তা করিয়াছে। এমন কি তাহা না হইলে এদিকে অগ্রসর হওয়াই হয় ত অসম্ভব হইত। সুতরাং এখন সেই বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

দূরবীক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব আলোচনা করিবার কিরূপ সুবিধা হইয়াছে? এরূপ প্রশ্ন উঠিলে তাহার একটী উত্তর হয় ত সকলের মনেই এক সময়ে উদয় হয়। শুধু চক্ষে যাহা দেখা যায় না দূরবীক্ষণ দিয়া তাহা খুব পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং আকাশের ঐ গ্রহ-নক্ষত্রগুলির আসল চেহারা কিরূপ, তাহা জানিবার পক্ষে দূরবীক্ষণ আমাদের যে সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

দূরবীক্ষণ।

এই উপায়ে যাহা জানা গিয়াছে তাহা যে অতিশয় আশ্চর্য্য, তাহাও সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা ছাড়াও দূরবীক্ষণের দ্বারা আমাদের যে কি উপকার হইয়াছে, তাহা হয় ত সকলের জানা না থাকিতে পারে। ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের হিসাবে এ সকল উপকার অতিশয় মূল্যবান। সুতরাং তাহার কথা কিছু বলা আবশ্যক।

আকাশ পর্য্যবেক্ষণের জন্য মানমন্দির (Observatory) সকল স্থাপিত হয়, একথা সকলেই জানেন। মানমন্দিরে বড় বড় দূরবীক্ষণ থাকে; তাহা লইয়া পণ্ডিতেরা রাত জাগিয়া আকাশ দেখেন। আকাশে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। অনেক আশ্চর্য্য জিনিস, অনেক সুন্দর জিনিস,—যাহা দেখিলে মনে আনন্দ হয়,

শিক্ষাও হয়। সুযোগ পাইলে পণ্ডিতেরা তাহা উপভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু Observatoryর প্রধান কাজ, কৌতূহল চরিতার্থ করা নহে। এমন কি, তাহাতে কৌতূহলের স্থান একেবারে নাই বলিলেই হয়। বিশেষ সতর্কতার সহিত, নক্ষত্রগণের যথার্থ স্থান, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে, মাপিয়া লিপিবদ্ধ করা, এবং এইরূপে আকাশের মানচিত্র প্রস্তুতের সহায়তা করা, ইহাই মানমন্দিরগুলির প্রধান কাজ। প্রত্যেকটী তারার স্থান নির্দ্দেশ করিতে যে কত বিষয়ে সতর্ক হইতে হয়, কত ব্যাপারের হিসাব লইতে হয়, সাধারণের তাহার কোনরূপ ধারণাই নাই। আর এই সকল হিসাব যে কতদূর সূক্ষ্ম, তাহাও যাঁহারা না জানেন, তাঁহাদিগকে একটী প্রবন্ধের ভিতরে বলিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। কেবলমাত্র আবশ্যকীয় একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।

কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে টাইকোব্রাহির কথা লইয়া আমরা তারাগণের দূরত্বের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলাম। এতদিন পরে পণ্ডিতেরা টাইকোব্রাহির আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর দিয়া, পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিধারে ঘোরে, তাহার আর একটী অকাট্য প্রমাণ বাহির করিয়াছেন। অর্থাৎ পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিবার দরুণ, তারাগণের দিকের যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা তাঁহারা কোন কোন স্থলে মাপিয়া বাহির করিয়াছেন। সুতরাং ঐ সকল স্থলে পরীক্ষিত তারার দূরত্বও নিরূপিত হইয়াছে। দিকের পরিবর্ত্তনটী কিরূপ তাহাই একবার দেখা যাউক। কিন্তু দিকের পরিবর্ত্তন প্রকাশ করিবার উপায় কি?

উপায় এইরূপ, ঠিক উত্তর হইতে ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ৯০ ডিগ্রি ব্যবধান; পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ ৯০ ডিগ্রি; দক্ষিণ হইতে পশ্চিম ৯০ ডিগ্রি; পশ্চিম হইতে উত্তর ৯০ ডিগ্রি। এইরূপে সমষ্টিতে সমস্ত দিঙ্মণ্ডলটীকে ৩৬০ ডিগ্রিতে ভাগ করা হয়। আমার সামনে একটী ট্যাঁক ঘড়ি রহিয়াছে। ইহার মিনিটের কাঁটাটাকে আমি ঠিক উত্তরমুখী করিয়া দিলাম। ইহারই মধ্যে সে দিক পরিবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেক মিনিটে উহার ছয় ডিগ্রী করিয়া দিকের পরিবর্ত্তন হয়। পোনের মিনিটে সে পূর্ব্বমুখী হইয়া যাইবে। এক ঘণ্টায় চারিদিক সমস্ত ঘুরিয়া শেষ করিবে। কেহ যদি ঘড়ির একটী মিনিটের ঘরকে ছয় ভাগ করিতে চেষ্টা করেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, এক ডিগ্রীর বিভাগটী কত সূক্ষ্ম। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্যায় সূক্ষ্ম হিসাবে ইহা এতই মোটা যে তাহাতে অধিকাংশ সময় কাজই চলে না। এক ডিগ্রীকে ৬০ ভাগ করিলে এক মিনিট হয়। এ ভাগটী এত সূক্ষ্ম যে, আমরা মনে মনে তাহার কোনরূপ ধারণাই করিতে পারি না। অথচ ইহাও জ্যোতির্ব্বিদ্যার সূক্ষ্ম হিসাবের পক্ষে নিতান্তই মোটা হইল। এক মিনিটকে ৬০ ভাগ করিলে এক সেকেণ্ড হয়। জ্যোতিষের সূক্ষ্ম মাপে, বিশেষতঃ তারাগণের স্থান পরিবর্ত্তনাদির মাপে, এইরূপ, অথবা ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম বিভাগ লইয়া কাজ করিতে হয়।

এক সেকেণ্ড যে কি পরিমাণ সূক্ষ্ম, একটী দৃষ্টান্ত দিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। একটী পয়সা এক ইঞ্চি চওড়া। মনে করুন, এই পয়সাটীকে চোখের সামনে ধরিয়া, একবার তাহার এপাশ হইতে, আর একবার তাহার ওপাশ হইতে, দূরস্থ কোনও সূক্ষ্ম জিনিষের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। এরূপ করাতে, পয়সাটী যে পরিমাণ চওড়া, সেই পরিমাণ, (অর্থাৎ এক ইঞ্চি মাত্র) আমার দৃষ্টির স্থান পরিবর্ত্তন হইল। আমার এই পরিমাণ স্থান পরিবর্ত্তনের দরুণ, আমার দ্রষ্টব্য সেই সূক্ষ্ম জিনিসটীতে কি পরিমাণ দিকের পরিবর্ত্তন হইল, তাহা জানিতে পারিলে, অতি সামান্য হিসাবের সাহায্যে বলা যায় যে, জিনিসটী কত দূর। দিকের পরিবর্ত্তন যদি এক ডিগ্রী হয়, তবে জিনিসটী ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি দূরে। দিকের পরিবর্ত্তন যদি এক মিনিট হয়, তবে জিনিসটী ২৮৬ ফুট দূরে। আর দিকের পরিবর্ত্তন যদি এক সেকেণ্ড মাত্র হয় তবে জিনিসটী সোয়া ৩ মাইল দূরে। অবশ্য দিকের এত সূক্ষ্ম তফাৎ, ভাল দূরবীক্ষণ, এবং বিশেষরূপে গঠিত অনুবীক্ষণ না হইলে ধরাই সম্ভব নয়।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, "এত পরিশ্রম করিয়া

যে সূক্ষ্ম হিসাব হইল, তাহা দ্বারা লাভ কি হইবে?" যে লাভের জন্য এই সব হিসাব করা, তাহা হচ্ছে,—নাবিকদিগের সুবিধা। অকূল সমুদ্রে তারাগণ ভিন্ন পথ-প্রদর্শক নাই। সুতরাং সেই তারাগণের গতিবিধি এবং অবস্থিতি সূক্ষ্মরূপে জানার নিতান্ত প্রয়োজন। উচ্চশ্রেণীর জরিপের কার্য্যেও, অনেক সময় তারাগণের স্থান নিরূপণ করিবার আবশ্যক হয়।

আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের হিসাবে ইহাতে বিশেষ লাভ এই যে, এই সূক্ষ্ম মাপের দ্বারাই, তারাগণের দূরত্ব এবং গতিবিধির কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। জ্যোতিষ্কগণের চেহারা সম্বন্ধে দূরবীক্ষণ যাহা দেখাইয়াছে, তাহাতেও ব্রহ্মাণ্ডের কথা জানিবার পক্ষে আমাদের অল্প সুবিধা হয় নাই।

বর্ণবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণের সাক্ষ্য অবিকল লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে ফটোগ্রাফী আমাদের প্রধান সহায়।

ফটগ্রাফী। (Photography.)

ফটোগ্রাফীর দুইটী বিশেষ গুণ আছে, যাহা আমাদের চোখের নাই। প্রথমতঃ, আলোকের একটী অদৃশ্য অংশ আছে। আমরা তাহা দেখিতে পাই না, কিন্তু ফটোগ্রাফিক প্লেটে তাহার দাগ পড়ে; এবং তাহা হইতে আমরা এরূপ অনেক কথা জানিতে পারি, যাহা অন্য উপায়ে জানা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, ফটোগ্রাফিক প্লেটের একটী বিশেষ গুণ এই যে, তাহাতে কোনও জিনিসের চেহারা ফেলিয়া, যত তাহাকে সময় (Exposure) বেশী দেওয়া যায়, ততই সে সেই চেহারার ক্ষীণ অংশগুলিকে ধরিয়া রাখিবার সুযোগ পায়। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে, চক্ষে যাহা মালুমই হয় না, ফটোগ্রাফিক প্লেটে তাহাও উঠিয়া থাকে।

বর্ণবীক্ষণের কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারা, তারাগুলির মধ্যে কি কি জিনিস আছে, এবং

বর্ণবীক্ষণ।

তাহা কিরূপ অবস্থায় আছে, তাহা মোটামুটি জানা গিয়াছে। আমাদের সূর্য্যের যে অবস্থা, তারাগুলিরও সেই অবস্থা। উহারা একএকটী সূর্য্য। অনেক সময়, দূরবীক্ষণ যে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই, Spectroscope তাহার উত্তর দিয়াছে। আকাশের অনেক স্থলে পুঞ্জীকৃত তারা আছে। ক্ষুদ্র দূরবীক্ষণে অথবা শুধু চক্ষে সেগুলিকে মেঘের মত দেখা যায়। খুব বড় বড় দূরবীক্ষণ দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার অনেকগুলিই তারার পুঞ্জ। কিন্তু আবার অনেকগুলি এরূপ আছে যে, নিতান্ত বড় দূরবীক্ষণেও তাহাদিগকে মেঘের মত দেখা যায়। উহারা কি বাস্তবিকই বাষ্পপুঞ্জ, না উহারাও তারার সমষ্টি,—দূরবীক্ষণ একথার উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু বর্ণবীক্ষণ প্রমাণ করিয়াছে যে, উহাদের অনেকগুলি বাস্তবিকই জলন্ত বাষ্প। আর কতকগুলি তারার পুঞ্জও আছে, অনেক দূরে থাকাতে দূরবীক্ষণে মেঘের মত দেখায়। আকাশের ঐরূপ জলন্ত বাষ্পকে নীহারিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন যে এই নীহারিকা হইতেই জগতের উৎপত্তি।

তারাগণের গতি যদি পাশের দিকে হয়, তবে দূরবীক্ষণে তাহা ধরা পড়ে। কিন্তু তারা যদি ঠিক সোজাসুজি আমাদের দিকে আসিতে থাকে, অথবা দূরে চলিয়া যাইতে থাকে, তবে দূরবীক্ষণ তাহার কোনও খবর পায় না। কিন্তু বর্ণবীক্ষণে এইরূপ গতি এবং তাহার পরিমাণ সহজেই ধরা পড়ে।

সৌর জগৎ।

বর্ত্তমান কালের পণ্ডিতগণ কিরূপ উপায়ে ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের চর্চ্চা করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইল। অতঃপর, এই সকল উপায়ের দ্বারা, ব্রহ্মাণ্ডের গঠন সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

প্রথমতঃ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে কি কি জিনিস আছে? এ বিষয়ে স্বভাবতঃই সকলের আগে, ঘরের কাছে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, হয় ত পৃথিবীর কথাই আমাদের প্রথমে মনে হয়। তার পরেই সূর্য্যের কথা, তারপর চন্দ্রের কথা, তারপর গ্রহতারা প্রভৃতির কথা। পৃথিবীকে

পৃথিবী।

তো আমরা জন্মাবধিই দেখিতেছি। ইহাতে আমরা বাস করি, ইহার

অন্নজলে জীবন ধারণ করি; ইহার কথা আর বেশী করিয়া কি বলিব? পৃথিবী যে খুব বড়, তাহা সকলেই জানেন। ইহার ব্যাস ৭৯২৭ মাইল। ওজন প্রায় ৬০ হাজার পরার্দ্ধ টন। ইহার সঙ্গী চন্দ্র, এখান হইতে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৪০ মাইল দূরে থাকিয়া, প্রায় ২৭ দিনে, ইহাকে একবার প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের ব্যাস ২ হাজার ১ শত ৬৩ মাইল। এই চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া, পৃথিবী, বৎসরে একবার করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে।

চন্দ্র।

সূর্য্য এখান হইতে প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। এবং উহার ব্যাস প্রায় ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল। পৃথিবীর ন্যায় প্রায় ১৩ লক্ষটা একত্র করিলে তবে সূর্য্যের সমান হয়। কিন্তু এত বড় শরীরের তুলনায়, সূর্য্য নিতান্তই হাল্কা। পৃথিবীর জিনিস দিয়া সূর্য্যের মত একটা পিণ্ড গড়িতে পারিলে, আর সেটাকে ওজন করিবার সুযোগ পাইলে, সেটা চারিটা সূর্য্যের সমান ভারী হইত।

সূর্য্য।

সূর্য্যের যে কিরূপ প্রচণ্ড তেজ, এখান হইতেই আমরা তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইতেছি। লোহার ন্যায় কঠিন জিনিসও সেখানে জলন্ত বাষ্পের আকারে আছে। সূর্য্য এত গরম না হইলে আমরা শীতেই মরিয়া যাইতাম।

পৃথিবী এবং সূর্য্যের মাঝখানে আরও দুটি গ্রহ আছে। বুধ, সূর্য্য হইতে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। উহার ব্যাস ২ হাজার ৯ শত ৬০ মাইল। আমাদের ৮৮ দিনে উহার এক বৎসর হয়।

বুধ।

শুক্র, সূর্য্য হইতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে। উহার ব্যাস ৭৯০০ মাইল। আমাদের ২২৫ দিনে উহার এক বৎসর হয়।

শুক্র।

মঙ্গল সূর্য্য হইতে ১৪ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে। আমাদিগের ৬৮৭ দিনে উহার এক বৎসর হয়। ইহার ব্যাস ৪১৮০ মাইল। মঙ্গলের দুইটি চন্দ্র আছে। তাহারা এত ক্ষুদ্র যে, উহাদিগের ব্যাস ৬।৭ মাইলের বেশী হইবে না।

মঙ্গল।

ইহার পরে কতকগুলি অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে। ইহাদের কোন কোনটা এত ক্ষুদ্র যে, উহাদের ব্যাস ১৫।২০ মাইলের বেশী হইবে না। এ পর্য্যন্ত ইহাদের সাড়ে চারি শতেরও অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সকলের বড়টির নাম ভেষ্টা (Vesta ; ইহার ব্যাস ২১৪ মাইল।

ক্ষুদ্র গ্রহগণ।

বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। আমাদিগের প্রায় ১২ বৎসরে ইহার এক বৎসর হয়। ইহার ব্যাস ৮৭৭০০ মাইল। আকারে ইহা ১২৭৯ টি পৃথিবীর সমান বড়, কিন্তু ওজনে ৩১০টি পৃথিবীর অধিক হইবে না। এ পর্য্যন্ত ইহার সাতটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৃহস্পতি।

শনিগ্রহ সূর্য্য হইতে ৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে। আমাদিগের ২৯ বৎসর ১৬৭ দিনে উহার এক বৎসর হয়। উহার ব্যাস ৭৫৬০০ মাইল। উহা ৭১৯ টি পৃথিবীর সমান বড়; কিন্তু ওজনে মোটে ৯২টি পৃথিবীর সমান। উহার আটটী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শনি।

ইউরেনাস্ সূর্য্য হইতে ১৭৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে। আমাদিগের ৮৪ বৎসর ৭ মাসে উহার এক বৎসর হয়। উহার ব্যাস ৩১০০০ মাইল। উহার চারিটী চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইউরেনাস্।

নেপ্‌চুন্ সূর্য্য হইতে ২৭৯ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে। আমাদিগের ১৬৪ বৎসর ২৮০ দিনে উহার এক বৎসর হয়। উহার ব্যাস ৩৭২০০ মাইল। উহার একটি চন্দ্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নেপ্‌চুন্।

ইউরেনাস্ এবং নেপ্‌চুনের কথা প্রাচীন পণ্ডিতেরা জানিতেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম হর্শেল দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইউরেনাস্ আবিষ্কার করেন। এবং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এডাম্‌স্ এবং লাভেরিয়ে নামক দুইজন

পণ্ডিত নেপ্‌চুন গ্রহের অবস্থিতি-স্থান গণনা দ্বারা স্থির করেন। তদনুসারে ঐ বৎসরেই এই গ্রহ আবিষ্কৃত হয়।

অনাবিষ্কৃত গ্রহ।

এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটি গ্রহের অস্তিত্বের কথা কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। সূর্য্য হইতে মোটামুটি পাঁচশত কোটি, সহস্র কোটি এবং তিন সহস্র কোটি মাইল দূরে, এই সকল গ্রহের স্থান অনুমান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত কেহই ইহাদের দর্শন অথবা ইহাদের অস্তিত্বের অন্য কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হন নাই।

অনেকে মনে করেন যে, বুধ আর সূর্য্যের মাঝখানেও একটা গ্রহ আছে। ইহার অস্তিত্বে তাঁহাদের এত বিশ্বাস যে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই ইহার নামকরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এই কল্পিত গ্রহের নাম Vulcan (ভালকান)। এই গ্রহও এপর্য্যন্ত পণ্ডিতদিগের দূরবীক্ষণকে ফাঁকি দিয়াই চলিয়াছে। গত সূর্য্যগ্রহণের সময়েও ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন নাই।

ভাল্‌কান্।

যাহা হউক, এই যে কয়েকটা গ্রহকে কল্পনা করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, ইহার আসল ঘটনাটা কি? বুধগ্রহের গতির কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিয়া Vulcan এর অস্তিত্বের অনুমান করা হইয়াছে। এ মত সকলে গ্রহণ করেন নাই। অনেকে দেখাইয়াছেন যে, অন্য কারণেও বুধের ঐ ব্যতিক্রমটুকু হইতে পারে।

আর নেপ্‌চুনের বাহিরের ঐ তিনটি গ্রহের সম্বন্ধে কথাটা এইরূপ। সৌরজগতের শাসনাধীন অনেকগুলি ধূমকেতু আছে। এই ধূমকেতুগুলি লম্বা লম্বা বাদামী আকারের পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণ বিষয়ে, ইহাদিগকে মোটামুটি একটা নিয়ম পালন করিতে দেখা যায়। সূর্য্য হইতে দূরে যাইতে যাইতে, ইহারা কোন একটা বড় গ্রহের কক্ষা অর্থাৎ ভ্রমণপথের কাছে আসিয়া থাকে।

পণ্ডিতদিগের সাধারণ মত এই যে, ধূমকেতুগুলি আমাদের এই সৌরজগতের জিনিস নহে। তাহারা অবাধ্য শিশুর মতন এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডময় ছুটিয়া বেড়ায়। পথে কোন সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সেই সূর্য্যের টানে বাধ্য হইয়া তাহার কাছে আসে বটে, কিন্তু সূর্য্য তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। ধূমকেতু তাহাকে পাশ কাটিয়া, চিরকালের জন্য তাহার হাত এড়াইয়া, পুনরায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণে বাহির হয়।

তবে সৌরজগতের ঐ ধূমকেতুগুলি কোথা হইতে আসিল? উহারা কি করিয়া, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিবার আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে নিযুক্ত হইল?

ইহার একটা উপায় আছে। সূর্য্যের চারিদিকে বড় বড় গ্রহগুলি পাহারাওয়ালার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটী ধূমকেতু সূর্য্যের কাছে আসিবার সময় ইহাদের কাহারও সঙ্গে যে তাহার দেখা হইবে না, এমন কোন কথা নাই। আর একবার দেখা হইলে যে এই সকল পাহারাওয়ালা, একটী বারও তাহাকে থামাইয়া বকসিস্ আদায়ের চেষ্টা করিবে না, এরূপ মনে করাও অন্যায়।

এইরূপে, একটা কোন বড় গ্রহের টানাটানিতে, যদি ধূমকেতুর গতির বেগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় তবে আর তাহার সূর্য্যের হাত এড়াইয়া যাইবার ক্ষমতা থাকে না। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে সূর্য্যের প্রদক্ষিণে নিযুক্ত হইতে হয়। এই প্রদক্ষিণের সময় প্রত্যেক বার তাহাকে, প্রথমে যে স্থানে গ্রহ কর্ত্তৃক ধরা পড়িয়াছিল, সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হয়। উহার অধিক আর সে দূরে যাইতে পারে না।

এ সকল কথা ভাবিয়া দেখিলে স্বভাবতঃই মনে হয়, যে সৌর জগতের ধূমকেতুগুলি আমাদের বড় বড় গ্রহগুলির আকর্ষণেতেই ধরা পড়িয়াছিল। তাই কতকগুলি বৃহস্পতির কক্ষার কাছে, কতকগুলি শনির কক্ষার কাছে, দুএকটা ইউরেনাসের কক্ষার কাছে, আর কতকগুলি নেপচুনের কক্ষার কাছে আসিয়াই আবার সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া যায়। এরূপ করিবার

পক্ষে এমন সঙ্গত কারণ থাকিতে, উহাদের ঐ ব্যবহার যে নিতান্ত আকস্মিক, ইহা মনে করা যায় কিরূপে? সুতরাং পণ্ডিতেরা গ্রহকর্ত্তৃক ধূমকেতু ধরা পড়িবার মতটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই নেপচুনের বাহিরে গ্রহ থাকিবার কথা অনুমান করিয়াছেন।

দেখা যায় যে, কতকগুলি ধূমকেতু Neptune এর বাহিরে অনেক দূরে গিয়া তবে ফেরে। সুতরাং উহাদের ঐ ফিরিবার স্থানে কোনও বৃহৎ গ্রহ থাকা আশ্চর্য্য নহে। ঐরূপ গ্রহ থাকিলে কেন যে দেখা যায় না তাহার কারণ এইরূপ হইতে পারে যে, এতদূরে থাকাতে তাহার আকারও অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া যায় এবং সূর্য্যের আলো কম পড়াতে, উজ্জ্বলতা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং তাহাকে দেখা অথবা ফটোগ্রাফ করা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে।

অতঃপর কয়েক ঝাঁক উল্কার কথা উল্লেখ করিলেই আমরা সৌর পরিবারের তালিকা শেষ করিতে পারি। উল্কাগুলির সহিত ধূমকেতুগুলির খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উহারাও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রমণকারী; আর অনেকটা ধূমকেতুর ন্যায় অবস্থায় পড়িয়াই আমাদের সৌর জগতের অধীন হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

পরিচয়।

(হেমকূট পর্ব্বতে দুষ্মন্ত-শিশু)

১

দেবতা-কিন্নর-যক্ষ-পুণ্যশীল নর-
বাসভূমি হেমকূট পর্ব্বত প্রধান;
প্রকৃতির স্নেহ-উৎস তটিনী-নির্ঝর
উথলিছে সেথা হোথা ব্যাকুলি পরাণ।

২

সামগীতি বিহগের কলকণ্ঠে মিশি'
পুণ্যের সুষমা কিবা জগতে বিস্তারি'
মানস-বিষাদ-গ্লানি পলকে বিনাশি'
উঠিতেছে উর্দ্ধমুখে দিবস-শর্ব্বরী!

৩

ফল-ফুল ভারানত বিটপী-বল্লরী
জড়াইয়ে পরস্পরে—দৃঢ় আলিঙ্গন!—
মধ্যাহ্নে শীতল ছায়া চৌদিকে বিতরি'
সুশ্যামল তৃণ মাঝে বিরাজে শোভন!

৪

সিংহ-শিশু মৃগ-শিশু প্রমত্ত সদায়
ভুলিয়া স্বভাব-বৈর কেমন সুন্দর;
উল্লম্ফন-আক্রমনে, নির্ভয়-ক্রীড়ায়,
নেহারি পূরে না কার বিস্ময়ে অন্তর!

৫

শান্তি-নিকেতনে হেন কে ওই বালক
আকর্ষিছে সিংহ-শিশু-কেশর ভীষণ;
ব্যথিত তথাপি হিংসা না করে তিলেক
অশান্তি শান্তির মাঝে কে করে সৃজন?

৬

"ছাড় বৎস, ছাড় ছাড় কেশরী-কেশর
নতুবা তোমারে ওযে করিবে হিংসন"—
পশ্চাতে তাপসী-কণ্ঠে ধ্বনে স্নিগ্ধতর
নির্ভয়ে বালক তবু করে আকর্ষণ!

৭

দুষ্মন্ত নৃপতি ভাবে রহি' অলক্ষিতে
কে এই তাপস-শিশু ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি,
বাৎসল্যের উৎস কেন ছুটে মোর চিতে—
প্রাণ কেন কাঁদি উঠে স্মরি তার স্মৃতি!'

৮

অগ্রসিলা নৃপমণি—আদেশে তাপসী
সিংহ-শিশু নর-শিশু হতে মুক্তি দিতে—
অনুজ্ঞা পালিয়া রাজা কহিলা সুহাসি
"তাপস-তনয় একি, চাহি মা জানিতে!"

৯

—"ক্ষত্রিয়-তনয়"-কহে তাপস-কুমারী—
"তাই হবে! পিতৃনাম?"—"বিশ্বাসঘাতক!
নিষ্কলঙ্ক সতী নামে অপবাদকারী,
উচ্চারি' তাহার নাম কে লবে পাতক?"—

১০

জানিতে মাতার নাম নৃপ কুতূহলী
আবার ভাবিলা তাহে কিবা অধিকার—
হেনকালে অকস্মাৎ "কোথা বৎস" বলি'
উপনীত শকুন্তলা—ঘুচিল আঁধার!—

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—দেবী।

সাত বৎসর হইল আত্মিক মিলন ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সাত বৎসরে এ ব্রত উদ্‌যাপন করিতে আমার যত ক্লেশ হইয়াছে তোমার ততোধিক হইয়াছিল। বাহিরের কত কাযে আমার শরীর মন নিযুক্ত থাকিত, তোমার সে সুবিধা ছিল না। তাই তুমি মাঝে মাঝে ম্লান হইতে। আমিও বুঝিতে লাগিলাম, এখনও চিত্তের শান্তভাব লাভ হয় নাই। * * * এই সকল ভাবিয়া যখন মন অন্ধকার হইতেছে এমন সময় একদিন দেখি, কি করিয়া ব্রহ্ম কৃপাতে তুমিও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছ; কি করিয়া তুমিও আমার ভাব অন্তরে পাইলে ও বুঝিলে, শরীরকে আরও দূরে না রাখিলে এ সাধনে সিদ্ধি হইবে না। তোমার ভাবায় সে দিন তুমি বলিলে, "অদ্য হইতে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল" অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত পরস্পরের শরীর পরস্পরের অস্পৃশ্য হইল। আত্মা ও শরীর দুই লইয়া যে সম্বন্ধ ছিল, এখন হইতে তাহা কেবল আত্মা লইয়াই থাকিবে; অপর অর্দ্ধাঙ্গ থাকিয়াও থাকিবে না। আমি দৈনিকে লিখিলাম, "এখন অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইল। এমন অবশ করা তোমার শক্তি দ্বারাই হয়। তুমি যাহা করিলে, তাহার জন্য তোমাকে কৃতজ্ঞতা দি। পূর্ব্বে আমি চাহিয়াছিলাম, যে জোর করিয়া স্ত্রীকে আলাদা করিয়া দি; শরীর অস্পৃশ্য রাখি; কিন্তু তখন তাহা হইল না। জোর করিয়া হয় না, পৃথিবী যেন এই শিক্ষা পায়।"

সেই দিন হইতে, দেবি, তুমি আমার কাছে দেবী হইলে। শরীরের প্রভাব আত্মাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তোমার পক্ষে আর কিছুই অসম্ভব রহিল না। * * * এখন হইতে তুমি আরও মন খুলিয়া কথা বলিতে লাগিলে; দেখিলাম চিত্তের দুর্ব্বলতার কথা পরস্পরকে বলিলে আরও বল পাই। মনের গতি কোন্ মুহূর্ত্তে কিরূপ হইয়াছিল, পূর্ব্বে সব বলিতে সাহসী হইতাম না। এখন হইতে অবাধে সব বলিতে লাগিলে, আমিও বলিতে লাগিলাম।

* * * * * *

ইহার পর আমাদের ইচ্ছা হইল, আমাদের "আধ্যাত্মিক বিবাহ" অনুষ্ঠান হউক। এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে প্রসঙ্গ হইত। ক্রমে এই অনুষ্ঠানটী আমাদের দুজনেরই প্রাণের অত্যন্ত ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার বিষয় হইল। ১৮৯১ সালের ৫ই জানুয়ারী তোমার শরীর একটু বেশী খারাপ হয়। তখন তুমি বলিয়াছিলে, "তবে বুঝি আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠান হইল না।" ভয় করিয়াছিলে, পাছে দেহ ত্যাগ হয় ও পাছে এলোকে আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান না হয়। অনেক দিন যাহার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিবাহ হইতেছে না, ক্রমাগতই কোন না কোন ব্যাঘাত হইতেছে, এমন নায়িকার মনের যে অবস্থা হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা হইল। আমি অনেক আশ্বাস বাণী বলিলাম। বলিলাম, "উৎসবের পর রাজগৃহে বিবাহ হইবে, তাহার তো অনেক বিলম্ব আছে; তুমি শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইয়া ওঠ। বিবাহ হইবে বৈ কি?" এরূপ কথা কহিতে কহিতে সে দিন অর্দ্ধরাত্রি নিদ্রা হইল না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—আধ্যাত্মিক বিবাহ।

১৮৯১ সালের উৎসব আসিল। বাঁকিপুরে মাঘোৎসব

করিয়া ২৪শে জানুয়ারী ১২ই মাঘ রাজগৃহ যাত্রা করিলাম। সকলেই তীর্থ যাত্রায় চলিয়াছেন ; কেবল দুজন যাত্রীর, তোমার ও আমার, ভাব আরও গভীর। আমরা দুজনাই অনন্ত উৎসবে মিলিত হইতে চাহিতেছিলাম। ভিতরে আত্মা যাহা চাহিতেছিল, বাহিরে বন্ধু বান্ধবদিগকে কিরূপে তাহা জানাইব, সেই চিন্তা করিতেছিলাম। মনের এই আনন্দের ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে হঠাৎ একটু বাধা হইল ; তাহা আমারই দোষে। ২৪শে জানুয়ারী রাত্রিতে বেহার পান্থভবনে অবস্থিতি কালে শ্রদ্ধেয় * * * মহাশয়ের সঙ্গে একটী বিষয় লইয়া আমার তর্ক হয়। তোমার ইচ্ছা ছিল না যে আমি অত তর্ক করি। শেষে যখন উঠিয়া আসিলাম, তখন আমার মুখ মলিন, মনও বড় খারাপ। আমার মুখ যে অপ্রসন্ন তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে, জানি না। কিন্তু নিজের ঘরে গিয়া যখন প্রার্থনা করি, তোমার সহানুভূতি পূর্ণ চক্ষের জলে আমার বক্ষ অভিষিক্ত হইয়া গেল। তোমার আশ্বাসে আবার বল পাইলাম।

২৫শে আহারাদির পর রাজগৃহ যাত্রা করিলাম। সন্ধ্যার সময় তথায় পৌঁছিলাম। সেই তর্কের পর হইতে মন ভাল নাই। কোনও রূপে রাত্রি কাটিয়া গেল। ২৬শে সকালে দেখি, কাহারও মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কেহ কাহারও সঙ্গ লইতে চাহিতেছেন না, সকলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বসিলেন। রাজগৃহে আসিয়া ত এমন কখনও হয় না। উপাসনা হইল বটে, কিন্তু সারাদিন যেন অন্ধকারে কাটিল। এদিকে, দেখি, তুমি বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত ; আমিও প্রস্তুত। ২৭শে ভোরে সেই ধর্ম্মশালার এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে প্রার্থনা করিয়া তোমার মস্তক স্পর্শ করিলাম এবং ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে ধৌত করিয়া স্বহস্তে ক্ষুর দিয়া মুণ্ডন করিলাম। আমার হাত কাঁপিতেছিল, —কখনও ত কাহারও ক্ষৌরকার্য্য করি নাই। তোমার মস্তক মুণ্ডন করিয়া আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ হইল ;—তোমাকে এমন সুন্দর আর কখনও দেখি নাই! তোমার বাল্যমূর্ত্তি, যৌবনের মূর্ত্তি, কোন মূর্ত্তিই ইহার মত নয়। দেব প্রভা যেন তোমার মুখমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কি চক্ষেই যে তোমাকে দেখিতেছিলাম! স্বর্গে গিয়া যে জড়ভাবমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিব, এ দিনের দর্শন যেন তাহারই পূর্ব্বাভাস!

নাপিত ডাকিয়া আমারও ক্ষৌর কার্য্য করা হইল। তারপর উপাসনা। এইবার শ্রদ্ধেয় * * বাবুকে জানাইলাম যে অদ্য আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ। এতক্ষণ আমাদের মুণ্ডিত মূর্ত্তি কেহ দেখেন নাই। এখন দেখিবামাত্র, দেখি, মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের মন সম্ভ্রমে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্লান উপাসনা সভা সজীব হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধেয় * * মহাশয়েরও মনের সেই ভাব কোথায় চলিয়া গেল। তিনি অনুপ্রাণনে প্রমত্ত হইয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন। উপাসনার পরে নবসংহিতা অনুসারে আমাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল। সংহিতায় আছে ৭ দিনের জন্য এই ব্রত লইবে ; আমরা বলিলাম, অনন্ত কালের জন্য।

শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয় ব্রহ্মকন্যার অবতরণ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন জগতে মহাপুরুষ অনেক আসিয়াছেন, কিন্তু মহানারী অদ্যাবধি আসেন নাই। এইবার তাঁহার আগমন হইল। মহানারীর যে সকল লক্ষণ থাকা উচিত, তাহা তোমাতে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই তোমাকে এ আখ্যা দিলেন। আমি ত আগে তোমার মহানারীত্ব দেখিতে পাই নাই। আমার ঘোরীকে আমি নিজেই আদর করিতাম, পূজা করিতাম ; আবার অপূর্ণতা দেখিলে মুখ আঁধার করিয়া থাকিতাম। ঘরে থাকিতে বলিয়া বুঝি তোমায় আগে বুঝি নাই। তুমি যে মহানারী তাহা এখন আমাকেও স্বীকার করিতে হইল।

সকলের উপাসনার পর সকলের মনে আমাদের আদর করিবার জন্য একটা আশ্চর্য্য আবেগ উপস্থিত হইল। সন্ধ্যার সময় ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণ তোমাকে ও আমাকে পট্টবস্ত্র পরিধান করাইলেন। উপাসনার পর কন্যা বরের বরণ হইল। 'কন্যাবর' কেন, 'বরকন্যা' কেন নয়, তাহা মনে আছে ত? যখন শরীরের বিবাহ হইয়াছিল, তখন 'বরকন্যার' বরণ হইয়াছিল। এখন "কনের" দিন পড়িল, তিনি "বরের" পূর্ব্বে গেলেন। কন্যার মাঙ্গে

ঘরের মাঝ হইল। তাঁহারা দুই জনে মাঝ খানে; চারিপাশে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা বাতির ডালা হাতে লইয়া হুলুধ্বনি করিতে করিতে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন। আমার মনের যে কি অবস্থা হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। এ পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গেলাম। অশরীরী আত্মা তুমি আমার নিকটে যাহা হইয়াছ, তখন যেন তাহাই হইয়া গেলে।

এই দিনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাই ষষ্ঠীদাস তাঁহার দৈনিকে লিখিয়াছিলেন, "উপাসনা স্বর্গের উপাসনা। আজ মহাব্যাপার। ভক্তিভাজন সাধক প্রকাশ বাবু ও তাঁহার ভার্য্যা অঘোর কামিনী আধ্যাত্মিক বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। আহা, আজ কি মনোহর দেবদৃশ্য! বিধাতা আজ স্বয়ং পুরোহিত হইয়া এই উভয় সন্তানকে বিবাহ সূত্রে বাঁধিয়া দিলেন। এ বরকন্যার আর শরীরের সম্বন্ধ নাই। ইঁহারা বার বৎসর হইল সাধন আরম্ভ করিয়া আজ নয় বৎসর কাল ইন্দ্রিয়কে একেবারে দমন করিয়াছেন। তাঁহারা সাক্ষ্য দিলেন, এ নিগ্রহে তাঁহাদিগকে অনেক কাঁদিতে হইয়াছে, অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে, কিন্তু পরে যে সুখ শান্তি পাইয়াছেন তাহার সঙ্গে তুলনায় সে কান্না, সে দুঃখ কিছুই নহে। এই ব্যাপার সকলের মনে একটা স্বর্গীয় ভাব আঁকিয়া দিয়া গেল। এখন প্রকাশ বাবুর বয়ঃক্রম ৪৪ ও অঘোর কামিনীর ৩৬ বৎসর। রাত্রে বরকন্যার বরণ—অমর ধামের ব্যাপার; পরে সঙ্কীর্ত্তন। দয়াময়, তোমাকে ধন্যবাদ। রাজগৃহ, না স্বর্গ?"

বল ত, ২৭শে জানুয়ারী কেন "স্বর্গের উপাসনা" হইল? কেন সে দিন দেবদৃশ্য হইয়াছিল? তুমি যে দেবী, দেবকন্যা তাহা সকলেই একবাক্যে কেন স্বীকার করিয়াছিলেন? যদি মানবী থাকিতে তাহা হইলে মস্তক মুণ্ডন করার পর ত ভাল দেখাইত না। বিশেষতঃ নারী যখন সুশোভিতা, সালঙ্কারা, দীর্ঘকেশী হন, তখনই তিনি দেখিতে সুন্দরী হন, কিন্তু আজ যে তোমার কোন অলঙ্কার নাই, তুমি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ, আজ কেন তোমাকে দেখিতে এত সুন্দর লাগিল? আজ তুমি অসংসারী, আজ তুমি সন্ন্যাসিনী, আজ তুমি আত্মাময়ী, তাই তোমার স্বর্গের রূপ। তাই ভাই ষষ্ঠীদাস দেবদৃশ্য বলিলেন।

মনে পড়ে দেবি, ব্রতের প্রথম ছয়মাস কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে কাটাইয়াছিলে? একাকী শয়ন করিতে, আর চক্ষের জলে মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইত? কেন, দেবি, আমাকে বলিতে না? বলিলে হয়তো তোমার চক্ষের জলের সঙ্গে আমার অশ্রুবারি মিশ্রিত করিয়া তোমার দুঃখভার লাঘব করিতাম। অথবা যাহা করিয়াছিলে, ভালই করিয়াছিলে। হয়তো তোমার চক্ষের জল দেখিলে আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়া যাইত। আর "বিনা দুঃখে হয় না সাধন", একথাও তো সত্য। সে দুঃখভার বহন না করিলে আজ কি দশা হইত বল দেখি? আত্মার বিবাহও হইত না। আজ তোমার শরীরে বঞ্চিত হইয়া আমি অন্ধকার দেখিতাম। তাই বলি, যোরী, তোমার কষ্ট বৃথা যায় নাই। "অশ্রু-সলিল ধৌত হৃদয়ে" আমরা আত্মার সম্বন্ধ ভিক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সলিলই আমাদের অভিষেকের জল হইয়াছিল।

অভিষেকের কথায় মনে হইল, রাজগৃহে স্নানের সময় অভিষেক হইত। কিন্তু ২৭শে জানুয়ারী রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তুমি আমাকে বলিলে "অভিষেক হইবে, কুণ্ডে চল।" সকলে তখনও নিদ্রিত; দুজনে ব্রহ্মকুণ্ডে আনন্দমনে গমন করিলাম। সেখানে তোমার চরণে ও মস্তকে আমি সুগন্ধি তৈল অর্পণ করিলাম। তুমিও সেইরূপে অর্পণ করার পর ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জল দ্বারা তোমার অভিষেক শেষ হইল। পরিষ্কার জল, আকাশ পরিষ্কার, সময় গম্ভীর; স্বামী স্ত্রীর অভিষেক করিলেন; আবার স্বামী অভিষেকের জন্য মাথা পাতিয়া দিলেন, স্ত্রী তাঁহার অভিষেক কার্য্য শেষ করিলেন। এ বিষয়ে তুমি আমায় যাহা দিলে আমিও তোমায় তাহাই দিলাম। স্বামী বলিয়া আমার প্রাধান্য কোনও দিন রাখি নাই। এটুকু অন্য হইতে আমাদের প্রভেদ।

২৮শে জানুয়ারী—বাবুর বিধবা ভগিনী মস্তক মুণ্ডন করিলেন। তিনি যুবতী বালবিধবা। এতদিন বৈধব্য বেশ ধারণ করেন নাই। তোমার এই মূর্ত্তি দেখিয়া

তাঁহারও মন প্রশস্ত হইল। তুমি স্বয়ং তাঁহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিলে। কখনও ক্ষৌর কার্য্য কর নাই, ঈশ্বরচরণ ভরসা করিয়া এ কার্য্যও সমাধা করিলে। তোমার দেখাদেখি ইনিও আজ চির জীবনের তরে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। তোমার অনুসরণ করিয়া তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসায় আবদ্ধ হইলেন, এবং আত্মিক বিষয়ে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারও জীবনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

শুকতারা।

হাসি হাসি আসি নিশা অবসানে
কে তুমি উদিলে পূরব গগনে।
গগনের গায়ে আলো ছড়াইয়া
হাসি ঢলি পড় কি যেন কারণে।

তোমার হাসিতে হাসিয়া আকুল
ও পূরব দিশি আপনা পাসরি।
কোথা হ'তে এলে? এলথেল আলো
এলাইয়া হ্যালো দিতেছ বিকীরি।

ঝক্ ঝক্ করি হীরক-বরণি,
জ্বলিছ আপনি আপন কিরণে।
এরূপ উজল রূপ হেরি নাই
সহসা এ রূপ পাইলে কেমনে?

বল দেখি সখি, কি বারতা নিয়ে
পূরব আকাশে উদিত হইলে।
ধীরি ধীরি ধীরি পূরব হইতে
সুবাতাস বুঝি বহিয়া আনিলে?

বুঝেছি বুঝেছি, তুমি তারারাণী,
সমুদিত হও যে দেশে যখন,
সে দেশের নিশা তখনি পোহায়,
আঁধার তখনি করে পলায়ন।

কিরণ ছড়ায়ে উঠে দিনমণি,
জাগি উঠে সবে, থাকে না শয়নে।
সে দেশ হইতে যায় পলাইয়া
হিংস্র, চৌর, দস্যু আপন সদনে।

বুঝেছি বুঝেছি, তাই বুঝি তারা,
সুবারতা নিয়ে উদিলে পূরবে।
আঁধারের লেশ পূরব ধরায়
থাকিবে না আর—বলিছ গরবে।

বুঝাইছ সবে, নিশা অবসান,
বুঝাইছ সবে উদিছে তপন।
জড়তার সহ অলসতা ছাড়ি
জাগি উঠ সবে, ছাড়িয়া শয়ন।

হাসি মুখে তুমি এ অমিয়া-রাশি
বরষি, করুণা বরিষ এ ভবে।
কিছু কাল পরে কে তোমা দেখিবে?
দিনমণি সনে মিশিয়া যাইবে।

ওগো তারারাণি, তোমার চরণে
আঁজল ভরিয়া দিতেছি কুসুম।
নমি আমি তোমা, ওগো সুখ-তারা,
মোদের আঁখির ভাঙ্গ ভাঙ্গ ঘুম।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।*

বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ।

পুরাকালে সৌবীর দেশে সঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার জননীর নাম ছিল বিদুলা। বিদুলা,

* আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহাশয়ার কবিতাটী প্রকাশিত করিতেছি। ইনি রংপুরনিবাসী দেশবিখ্যাত মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের পত্নী। ইঁহার আরও পদ্য এবং গদ্য রচনা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট অধিকার আছে। বোধ হয় ইংরাজীতেও অনভিজ্ঞা নহেন। ভাঃ মঃ সঃ।

ধর্ম্মরতা, তেজস্বিনী ও তত্ত্বদর্শিনী ছিলেন। সৌবীর-রাজ সঞ্জয় স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ও অলস প্রকৃতির ছিলেন।

এক সময় সৌবীররাজ সঞ্জয়ের সহিত সিন্ধুরাজের যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে সৌবীররাজ সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ সঞ্জয় অতিশয় নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন, তিনি সর্ব্বদাই শয়ন করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন; কি উপায় অবলম্বন করিলে যে শত্রুকে পরাজয় করা যাইতে পারিবে সে সম্বন্ধে কোনই চেষ্টা করিলেন না। পুত্র সঞ্জয়ের এই অবস্থা শুনিয়া মনস্বিনী বিদুলা অতিশয় দুঃখিতা হইলেন; এবং সদুপদেশ দ্বারা নির্ব্বেদপ্রাপ্ত পুত্রকে উৎসাহিত করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এইরূপ ইচ্ছা করিয়া বিদুলা সঞ্জয়ের নিকট গিয়া দেখিলেন, সঞ্জয় নিশ্চেষ্টভাবে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার বদন অতিশয় মলিন। তখন বিদুলা সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ—

"বৎস, তুমি নিতান্ত কাপুরুষের মত ব্যবহার করিতেছ কেন? তুমি কি জান না যে তুমি কোন্ মহৎ কুলে জন্মগ্রহণ করেছ? যে মহাত্মারা আমাদের এই কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা ভীত হয়ে কখনও কারও নিকট নত হন নাই। তুমি তাঁদের বংশে কি কুল-পাংশুল জন্মগ্রহণ করেছ? তোমার মত কাপুরুষকে পুত্র বলে স্বীকার করতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। কেন তুমি সামান্য ব্যক্তির ন্যায় যাবজ্জীবন নিরাশায় কাল যাপনে প্রবৃত্ত হয়েছ? তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের ইহা কর্ত্তব্য হয় না।

পুত্র, আলস্য ত্যাগ কর। ওঠ, শত্রুগণের আনন্দ এবং মিত্রগণের শোক বর্দ্ধন করো না। হয় তুমি নিজের প্রভাব দেখিয়ে স্বরাজ্য উদ্ধারে প্রবৃত্ত হও, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ কর। রাজ্যহারা ও কীর্ত্তিহারা হয়ে বৃথা জীবন ধারণের ফল কি? লোকে যার অদ্ভুত মহৎ চরিত্রের বিষয় কল্পনা না করে সে স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, তার জন্ম কেবল লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য। বৎস, আর বৃথা চিন্তায় কালযাপন করো না, প্রবল পরাক্রমে শত্রুগণকে আক্রমণের উদ্যোগ কর। পরের পরাক্রম সহ্য করতে পারে না ব'লে নরের নাম হয়েছে পুরুষ, তুমি মহৎকুলে উৎপন্ন ক্ষত্রিয় হয়ে কেমন করে শত্রুগণের পরাক্রম সহ্য কচ্ছো?

বৎস, মুমূর্ষু ব্যক্তি ঔষধ সেবনে যেমন অরুচি প্রকাশ করে, আমার বোধ হচ্ছে যে আমার এই সকল উপদেশ বাক্যও তেমনি তোমার কাছে ভাল বোধ হচ্ছে না। কিন্তু তোমার যদি কিছুমাত্র দূরদৃষ্টি থাকতো তা' হলে তুমি বুঝ্‌তে পার্‌তে যে সিন্ধুরাজকে পরাজয় করা বিশেষ কঠিন কাজ নয়, তুমি বোধ হয় জান না, যে সিন্ধুরাজের প্রজাগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নয়, তাঁর অনেক ছিদ্র রয়েছে। অতএব এই সুযোগে তুমি আত্মপক্ষের সহিত মিলিত হয়ে গিরিদুর্গে গমন কর এবং সেখানে গিয়ে সিন্ধুরাজের ব্যসন ও অবসর অনুসন্ধান কর। সিন্ধুরাজ অজয় ও অমর নন।

বৎস, তোমার নাম সঞ্জয়। এখন সেই সঞ্জয় নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। লাভালাভে নিরপেক্ষ হয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, প্রাণের মায়া করো না।"

সঞ্জয় বলিলেন, "মা, আপনি আমাকে এই সকল কথা যে কেমন করে বল্‌লেন তাই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। মা হয়ে একমাত্র পুত্রকে কি কেহ এই সব কথা বলতে পারে? আপনি আমাকে ভীষণ যুদ্ধে যাত্রা কর্‌বার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত কর্‌ছেন, সে যুদ্ধে আমার প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার হৃদয় নিশ্চয় পাষাণে নির্ম্মিত! আপনি বিবেচনা করুন, যে আমার মৃত্যু হ'লে এ সংসার আপনার নিকট মরুভূমি তুল্য হয়ে যাবে। অতএব আপনি আমাকে দয়া করুন। যুদ্ধ করতে বল্‌বেন না। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করা আমার সাধ্য নয়।" বিদুলা বলিলেন, "বৎস, মানুষের সকল অবস্থাতেই ধর্ম্ম ও অর্থ চিন্তা করা উচিত; সেই জন্যই আমি তোমাকে যুদ্ধে নিয়োগ কচ্ছি। তুমি অসামান্য শক্তিসম্পন্ন, শত্রুগণকে আক্রমণ করবার উপযুক্ত অবসরও উপস্থিত হয়েছে। তুমি যদি এসময়ে কর্ত্তব্য কার্য্যে উপেক্ষা কর তা' হলে তোমার অত্যন্ত অন্যায়

কার্য্য করা হবে। আর আমিও যদি এ সময়ে তোমাকে কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ দেখে কিছু না বলি, তা' হলে আমারও গর্দ্দভীর ন্যায় অকারণ ফলবিহীন বাৎসল্য দেখান হবে। তুমি বীরত্ব প্রদর্শন ক'রে রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করলে বীরপ্রসবিনী বলে আমি আখ্যাত হব। ক্ষত্রিয় রমণীর অন্তরের কামনা এই, যে সে বীর-পত্নী ও বীরমাতা হবে।

যুদ্ধ ও জয়লাভ করবার জন্যই ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে জয়লাভ বা প্রাণত্যাগ করলে অবশ্যই সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় তুমি আমার চক্ষুশূল হয়েছ। যখন দেখ্‌ব, যে তুমি সমুদয় সিন্ধুদেশবাসিগণকে যুদ্ধে পরাজয় করেছ, তখন আমি তোমাকে যথোচিত স্নেহ ও সম্মান করব; তখন আমার আনন্দের সীমা থাক্‌বে না।"

সঞ্জয় কহিলেন "মা, আমি এখন ধনহীন ও সহায়হীন হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় কেমন করে জয়লাভ করব, এই ভেবে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা ত্যাগ করেছি। আপনি যদি আমার জয়লাভের কোন উপায় উদ্ভাবন করে থাকেন তো বলুন, আমি আপনার আজ্ঞা পালনে প্রস্তত আছি।"

বিদুলা বলিলেন, "বৎস, পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ নাই বলে ক্ষুব্ধ হয়ো না। অর্থ না থাক্‌লেও তা' সঞ্চয় করা যায়; আবার সঞ্চিত অর্থও নষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা কর্ম্মফল অনিত্য বলে জানেন, তথাপি তাঁরা কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হন না। এই জন্যে তাঁরা কখন বা কর্ম্মফল প্রাপ্ত হন, কখন বা হন না। আর যারা কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হয়ে নিশ্চেষ্টভাবে কালযাপন করে তাদের কখনই ফললাভ হয় না, নিশ্চেষ্টতার একমাত্র ফল অভাব, চেষ্টার ফল দুই প্রকার; প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি, প্রাপ্ত ব্যক্তি, অবশ্যই কার্য্য সিদ্ধি হবে, মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় ক'রে, উৎসাহের সহিত শ্রেয়স্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হয়ে থাকেন, অতএব তুমি পুরুষকার প্রদর্শন ক'রে অভিপ্রেত পুরুষার্থ উপার্জ্জনে যত্নশীল হও।

বৎস, ভীত হয়ো না। কোন বিপদেই রাজার ভীত হওয়া উচিত নয়। আমি তোমার প্রভাব, পুরুষকার, বুদ্ধির পরীক্ষা, তেজোবৃদ্ধি এবং ধৈর্য্যবিধানের জন্য এই সকল কথা বল্‌লাম। যদি আমার কথা তোমার হৃদ্‌গত ও যথার্থ বলে বোধ হয়ে থাকে, তাহলে তুমি স্থিরচিত্ত হয়ে জয়ার্থ সমুত্থিত হও। তুমি একথা জান না যে আমাদের অনেক গুপ্তধন আছে। আমি ভিন্ন আর কেহ সে কথা জানে না। আমি সেই অর্থ তোমাকে দিব। তোমার বহুসংখ্যক কার্য্যক্ষম অকপট বান্ধবও বিদ্যমান আছেন। তুমি আমার প্রদত্ত ধন ও ঐ সকল শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের সাহায্যে কার্য্য সাধনে তৎপর হও।"

সঞ্জয় বলিলেন, "মা, আপনার অমৃতময় উপদেশে আমার মনের অন্ধকার ও নির্ব্বেদভাব দূর হল। আপনি আমাকে সর্ব্বদা শ্রেয়স্কর পথে প্রবর্ত্তিত করে থাকেন।

অতএব হয় আমি শত্রুকর্ত্তৃক অপহৃত পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করব, না হয় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করব। আপনার উপদেশে আমি এখন শত্রুগণকে নিগৃহীত ও পরাজিত কর্‌বার জন্যে উৎসাহিত হয়েছি।"

বিদুলার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় অচিরে সিন্ধুরাজকে পরাজয় করিয়া পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া লইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি বিদুরের গৃহে অবস্থান করিতেন। কুন্তীও তখন বিদুরের গৃহে বাস করিতেন। সন্ধি হইল না বলিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডব-দিগের নিকট বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইলেন। সেই সময় পাণ্ডবজননী কুন্তী, কৃষ্ণের নিকট উক্ত বিদুলা-সঞ্জয় সংবাদ কীর্ত্তন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "বৎস, বিদুলা তাঁর পুত্র সঞ্জয়কে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তুমি আমার পুত্রগণকে, বিশেষতঃ শান্তি-প্রিয় যুধিষ্ঠিরকে বলিবে যে, আমিও তাহাদিগকে সেই কথাগুলি বলিয়াছি।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

প্রার্থনা।

সরাইয়া হৃদয়ের ঘন কুহেলিকা
তোমার আলোক-ধারা ঢেলে দাও প্রাণে,
মৃত প্রাণে পশি মোরে জাগাইয়া দাও,
—জাগাইয়া দাও তব উন্মাদক গানে।
ক্ষুদ্র মোর স্বার্থ-চিন্তা, পরশে তোমার
নীরবে শুখাক্, আশা জাগুক আবার।
প্রীতিস্পর্শে বসন্তের, জগতের অণু,
জাগে যথা হাসিমুখে লভি নব তনু,
ঘুচিয়া জড়তা হয় জীবন সঞ্চার;
মলিন বাসনাগুলি তেমতি আমার
নীরবে ঝরিয়া যাক্, ওহে প্রাণাধার!—
হে চির-আনন্দ! শান্তি!—পরশে তোমার।
দীপ্ত দুটী আঁখি তলে আশার কিরণ,
জাগুক শুনিয়া দেব তব আবাহন;
দূরে ফেলে জীবনের মোহ আবরণ,
তোমাতে ডুবিতে চাই, চিরন্তন ধন!

সরলা দত্ত।

কাশীধামে ভারত-মহিলা পরিষদ।

শ্রীমতী রামদুলারি দোবে লিখিত।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে কাশীধামে, 'নাগরী প্রচারিণী সভা' গৃহে ভারত-মহিলা পরিষদের অধিবেশন হইয়াছিল। মিসেস্ দোবে প্রবেশদ্বারে সমাগত মহিলাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে তিন শতাধিক মহিলা সমিতির কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে লিখিত হইল;—মিসেস্ রমেশচন্দ্র দত্ত; মিসেস্ সরলা রামভুজ দত্ত চৌধুরী, বি,এ; মিসেস্ কৃষ্ণরাও ভোলানাথ ও মিসেস্ বিদ্যা রমন ভাই বি, এ, (আম্দাবাদ); মিসেস্ পি, কে, রায়, মিসেস্ পি, মুখার্জ্জি ও মিসেস্ দাস (কলিকাতা); মিসেস্ জ্যোতিস্বরূপ (দেরাদুন); মিসেস্ এম, ভি, যোশী, মিসেস্ চিৎনিস (অমরাবতী); মিসেস্ মাধোদাস রঘুনাথ দাস, মিসেস্ খারে ও মিসেস্ নিকাম্বে (বোম্বে); মিসেস্ তারাবাই ওয়ানবে, মিসেস্ কাশীবাই দেবধর ও মিসেস্ পার্ব্বতী বাই আথবালে (পুনা); মিসেস্ এস, সিংহ ও মিসেস্ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ); মিসেস্ জোয়ালা প্রসাদ শঙ্খধর (এটা); মিসেস্ সাবিত্রী বাই (জলন্ধর কন্যা-মহাবিদ্যালয়); মিসেস্ চক্রবর্ত্তী (নাগপুর); মিসেস্ বিনীতা দেবী (বৌদাও); মিসেস্ দালজঙ্গ সিং (জয়পুর); মিসেস্ হেমন্তকুমারী চৌধুরী (শ্রীহট্ট)।

নিম্নলিখিত মহিলাগণের নিকট হইতে সহানুভূতি-সূচক পত্র পাওয়া গিয়াছিল;—মিসেস্ রমাবাই রাণাডে, মিসেস্ চন্দ্রবরকার, মিসেস্ সিরোর, মিসেস্ সরোজিনী নাইডু, মিসেস্ সখিয়ানাধন এবং অন্যান্য।

স্বস্তিবাচন ও জলন্ধর কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কর্তৃক ভজনান্তে পরিষদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

মিসেস্ দোবের প্রস্তাবে ও মিসেস্ নিকাম্বের সমর্থনে প্রতাপগড়ের রাণী সাহেবা সভাপতি মনোনীত হন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ রাণী সাহেবা কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকাতে জনৈক সম্পাদিকা কর্তৃক তাঁহার বক্তৃতা পঠিত হইয়াছিল। এই পরিষদ ও সামাজিক সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত তিনি প্রবল সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"সামাজিক সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্তৃক "ভারত-মহিলা পরিষদের" সভাপতি মনোনীত হইয়া আমি আপনাকে গৌরবান্বিতা মনে করিতেছি। যুক্ত প্রদেশে পরিষদের এই প্রথম অধিবেশন; বোধ হয় এজন্যই আমাকে সভাপতি মনোনীত করা হইয়াছে। প্রাচীনকালে নারীগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন এবং কেবল নিজেদের মধ্যে নহে, পুরুষদিগের সভায়ও বক্তৃতা করিতেন। সমাজ সংস্কারের এই বিভাগটীর প্রতি মনোযোগ না দেওয়াতে যুক্ত প্রদেশ এবিষয়ে অনুন্নত। কিন্তু কিছুকাল

হইতে এই প্রদেশবাসীগণও সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন। কাশীধামে মহিলাদিগের অদ্যকার এই সম্মিলনীই একথার সাক্ষ্য দিতেছে। এই 'নাগরী প্রচারিণী সভা'-গৃহের অনতিদূরে পবিত্র মণিকর্ণিকার ঘাট অবস্থিত। এই ঘাটে রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহার দুঃখের দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমি সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট এই রাজার কাহিনী বর্ণন করিব।"

তিনি আখ্যায়িকাটী বর্ণন করিয়া শ্রোতৃবর্গকে হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সত্যবাদী হইতে ও তারামতীর ন্যায় সতীত্বধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিলেন।

তৎপর তিনি বলিলেন যে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে এতগুলি মহিলাকে এই পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। "আমাদের পুনরুত্থানের অন্তরায় সকল দূর করা, নারীগণকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করা ও বাল্যবিবাহ, অবরোধ প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহে ব্যয়াধিক্য, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা সামাজিক সমিতির উদ্দেশ্য। উপস্থিত মহিলাগণ এই সামাজিক সমিতির কার্য্যে যোগদান করিবেন জানিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি।"

"ভগ্নীগণ, নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী। নারী পুরুষের সুখ দুঃখের সমাংশভাগিনী। সমাজের দুর্গতি দূর করা বিষয়েও তিনি পুরুষের সাহায্যকারিণী। বিধবা বিবাহ ব্যতীত আমরাও উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু প্রথমেই আমাদের স্মরণ করা উচিত, যে এই প্রকার সমিতি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও উপকারী। কারণ, এই সকল সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়া আমরা পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিতে, আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে এবং আমাদের ইষ্টানিষ্ট জানিতে পারি; পরস্পরকে জানিতে, ভালবাসিতে ও পরস্পরের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি। মিলিত শক্তি বলে আমরা আমাদের উন্নতি-পথের বিঘ্ন অতিক্রম করিতে এবং অভীষ্ট লাভ করিতে পারি। ঈশ্বরের এই রাজ্যে ক্ষুদ্র কতকগুলি পিপীলিকা একত্র হইয়া কত রাশীকৃত শর্করা গর্ত্তে সঞ্চিত করে আপনারা কি তাহা দেখেন নাই? সমবেত শক্তির প্রভাব এই প্রকার।"

"বাল্যবিবাহ অতি অনিষ্টকর প্রথা। আমাদের মধ্যে ইহা দৃঢ়রূপে মূল প্রোথিত করিয়া বসিয়াছে। বাল্য-বিবাহ মানুষের দেহ নাশ করে; ইহা শক্তিশালী হিন্দু-জাতির তেজস্বিতা নাশ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে এই প্রথা আধুনিক; ভারতবর্ষ বিজাতীয় অধিকারে আসিবার পর ইহা প্রচলিত হইয়াছে। বিদেশীয়গণ আমাদের কুমারীগণের উপর আক্রমণ করিত, এজন্য তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন হয়। বৃটিস অধিকারে এই প্রকার ভয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং আমাদিগকে প্রাচীন যৌবন-বিবাহ প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে।"

"প্রাচীনকালে চারি প্রকার আশ্রম ছিল। প্রথম আশ্রমের নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। পরিপক্ক অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে লোকে এই আশ্রমেই থাকিত। এজন্য সেকালে লোকে বলশালী হইত। পরিবার প্রতিপালনের ক্ষমতা জন্মিলে তাহারা গার্হস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিত। আমরা কি এই রীতির অনুসরণ করি? আমাদের অনেকেই এখন আশ্রম-প্রথার উপকারিতা বুঝিতে পারেন না; পক্ষান্তরে ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ আশ্রমকে এক করিয়া ফেলেন। সেকালে বিদ্যার্থীরা আত্মরক্ষার অস্ত্র স্বরূপ আত্মসংযম শিক্ষা করিত। কিন্তু বর্ত্তমানকালে পাঠ্যা-বস্থায়ই তাহারা পরিবার প্রতিপালনের ভারে ভারাক্রান্ত হয়। এই জন্য আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি না; আমাদের সকল আশা ভরসা বিনষ্ট হয়। এই সকল কুরীতি দমনের জন্য আমরা আজ এখানে মিলিত হইয়াছি। আমি আপনাদের সকলকে মিনতি করিয়া বলিতেছি, অল্প বয়সে আপনাদের সন্তানদিগের বিবাহ দিবেন না। শাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া পর পর আশ্রমগুলিতে প্রবেশ করিলে বড় উপকার হইবে। কাশীর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া আপনারা যদি এই "নাগরী প্রচারিণী সভায়" আসিবার পথ হারাইয়া

ফেলেন, তবে যে ব্যক্তি আপনাদিগকে ঠিক পথ দেখাইয়া দেয় তাহাকে কি ধন্যবাদ করেন না? আমরাও নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ যথার্থ পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। এখন আমাদের প্রাচীন আশ্রম চতুষ্টয়ের পথ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আপনাদের স্বামীগণ যখন অল্প বয়সে সন্তানের বিবাহ দিতে ইচ্ছা না করেন তখন আপনারা তাঁহাদের পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিবেন না, আপনাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছি। বিবাহের সামান্য আমোদ প্রমোদের জন্য ব্যস্ত হইবেন না, কিন্তু অল্প বয়সে ও বৃদ্ধ বয়সে বিবাহের অপকারিতার বিষয় চিন্তা করিবেন; সংস্কার কার্য্যে স্বামীগণের সহায় হইবেন। আমি বিশ্বাস করি, যে অতি নরাধম পাতকীও অনুতাপ করিয়া কাশীধামে পবিত্র হইয়া যায়। অতএব আসুন এই পবিত্র সলিলা গঙ্গাতীরে, এই মুহূর্ত্তে আমরা সংকল্প করি, যে আমরা সংস্কারের বীজ রোপন করিব এবং অতীত কালে যতই পাপ করিয়া থাকি না কেন, আমরা পুনরায় ধর্ম্মপথে প্রত্যাবৃত্ত হইব। ভগ্নীগণ, মনে রাখিবেন—'যাহারা আত্মোন্নতি করিতে চায় ঈশ্বর তাহাদিগকে সাহায্য করেন।' অতএব আপনারা সকলে উৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন।"

সভাপতির বক্তৃতার পর মিসেস্ দোবে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন ঃ—

"ভারতীয় মহিলাগণের এই সম্মিলনী এদেশে মাননীয়া শ্রীমতী যুবরাজ-মহিষীকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। এবং তিনি নানা স্থানে তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এদেশের নারীদিগের সম্বন্ধে হিতাকাঙ্ক্ষার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করিতেছেন।"

মিসেস্ রমনভাই বি,এ, এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। করতালি সহকারে এই প্রস্তাব সমর্থিত হয়, এবং উপরোক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম তারযোগে যুবরাজ-মহিষীকে জ্ঞাপন করা হয়।

নিম্নলিখিত মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত প্রবন্ধ পঠিত হয়। মিসেস্ জোয়ালাপ্রসাদ শঙ্খধর—'হিন্দু পত্নীর কি প্রকার হওয়া উচিত'; মিসেস্ কালওয়াতি—'স্ত্রী-শিক্ষা'; মিসেস্ রমনভাই বি,এ,—'বর্ত্তমান ভারতে নারীজাতির অবস্থা'; মিসেস্ মুখার্জি—'মাতৃপূজা'; মিসেস্ তারাবাই ওয়ানবে—'স্ত্রী-শিক্ষা'; মিসেস্ দেবধর—ঐ; মিসেস্ পি, কে, রায়—'আমাদের দায়িত্ব।'

দশ বৎসর বয়স্কা কুমারী প্রিয়ম্বদা 'প্রাচীন হিন্দু মহিলার অবস্থা' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিল।

সময়াভাবে নিম্নলিখিত মহিলাগণের লিখিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইতে পারিল না, কিন্তু পঠিত বলিয়া গ্রহণ করা হইল।

মিসেস্ বিদ্যাবতী—'গার্হস্থ ধর্ম্ম ও পাতিব্রত্য'; মিসেস্ সরস্বতী—'ব্রহ্মচর্য্য ও তাহার উপকারিতা'; মিসেস্ কুণ্ডে—'শিশুর জন্ম সম্বন্ধীয় বেদোক্ত সংস্কার'; মিসেস্ তারা—'হবনের উপকারিতা'; মিসেস্ বিনীতা দেবী—'বাল্য বিবাহের কুফল'; মিসেস্ হেমন্তকুমারী চৌধুরী—'বর্ত্তমান কালে ভারত-মহিলার কর্ত্তব্য'।

জলন্ধর কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমতী সাবিত্রী বাইও সময়াভাবে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বক্তৃতা করিতে পারেন নাই।

প্রবন্ধ পাঠান্তে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল যে, মিসেস্ রমাবাই রাণাডে মহাশয়াকে ভারত-মহিলা পরিষদের সম্পাদিকা হইতে অনুরোধ করা হউক।

মিসেস্ সরলা রামভুজ দত্ত চৌধুরী ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গান করেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ করিয়া সভা ভঙ্গ হইল। তৎপর পান ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

সভায় প্রবল উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, এবং প্রায় প্রত্যেক মহিলাকেই ভারতবর্ষের নারীদিগের উন্নতির জন্য কিছু না কিছু করিবার জন্য উৎসুক বোধ হইয়াছিল।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বোম্বাই মুসলমান-সমাজে স্ত্রীশিক্ষা—এদেশে মুসলমানগণ শিক্ষা বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষাও অতি অল্প পরিমাণেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্তঃপুরেও দিন দিন স্ত্রীশিক্ষা আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অনেক অন্তঃপুরচারিণী হিন্দুমহিলা এখন বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে মাননীয়া মিসেস্ আর, এস্, হোসেন ব্যতীত আর কাহারো নাম করিতে পারা যায় কি না জানি না। মুসলমান বন্ধুগণ বোধ হয় সামাজিক কারণে তাঁহাদের বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে সাহসী হন না। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, বোম্বাইএর শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দিন দিন উদার মত অবলম্বন করিতেছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় কুমারী সা-আদ ফয়েজ মহম্মদ এবং কুমারী আখ্তার নাম্নী দুইটী বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছেন। আমরা আশা করি আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান বন্ধুগণও স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবেন; আমাদের মুসলমান ভগিনীগণকে তাঁহারা আর কতকাল বর্ত্তমান উন্নত জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত রাখিবেন?

সেবা সদন—বোম্বাই প্রদেশের শ্রীযুক্ত মালবারী একজন দেশহিতৈষী ব্যক্তি। বহুদিন হইতে তিনি সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী আছেন। ভারত-নারীর কল্যাণের জন্য তিনি শীঘ্রই সেবা সদন নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। যে সকল মহিলা দরিদ্র-দিগের সেবা করিবেন, অথবা ধর্ম্মসাধনাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহারা এই আশ্রমে আশ্রয় পাইবেন। এই আশ্রম হইতে নারীদিগকে শুশ্রূষা-কার্য্য, চিকিৎসা-বিদ্যা ও শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইবে। অসাম্প্রদায়িক ভাবে এই আশ্রমের কার্য্য পরিচালিত হইবে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জ্জনের পত্নী প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি মালবারি মহোদয়কে এই গুরুতর কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এদেশের নারীদিগকে আত্মনির্ভর শিক্ষা দিয়া তাঁহাদের শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করিবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই সেবা সদনের কার্য্যারম্ভ ও কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।

নারীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের সম্মান-প্রদর্শন—আমাদের গবর্ণমেণ্ট নববর্ষ ও বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অনেক উপাধি ও পদক বিতরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা দান, সৎকার্য্য ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতির জন্য সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ ও গবর্ণণ্টের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারেন, তাঁহারাই এই সকল সম্মানের অধিকারী হইয়া থাকেন। গত নববর্ষ উপলক্ষে বোম্বাইয়ের দৌলতরাম উমরা সিংহের বিধবা পত্নী শ্রীমতী জানকী বাই; মান্দ্রাজ বালিকাবিদ্যালয় সমূহের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষয়িত্রী কুমারী এমা কার্ এবং দেরাদুন কন্যা-পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীমতী মহাদেবী কৈশর-ই-হিন্দ্ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পার্লামেণ্টের নব নির্ব্বাচন—ইংলণ্ডের রক্ষণশীল সম্প্রদায় প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। মধ্যে একবার উদার নৈতিক দল প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প দিনের জন্য। রক্ষণশীল দলের শাসনপ্রণালী সাধারণতঃ নিতান্ত সংকীর্ণ। ইংলণ্ডের জনসাধারণও ইঁহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এবার স্রোত ফিরিয়াছে। নবনির্ব্বাচনে উদার নৈতিক দল জয়লাভ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জন মর্লি ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরী মনোনীত হইয়াছেন। ইনি ন্যায়পরায়ণ লোক বলিয়া বিখ্যাত। আশা করা যায় ইঁহাদ্বারা ভারতবর্ষের অনেক কল্যাণ হইবে।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

AKB 168
2
১৫৯
Bod 278
4 JUL 1906
3rd-1906.

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's ; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free ;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow ?

Tennyson.

১ম ভাগ । | চৈত্র, ১৩১২ । | ৮ম সংখ্যা ।

আশা ।

প্রভাত উদিল হসিত আননে
স্বপ্ত আঙ্গিনা ভরি,
ত্যজিয়া ঘুম মেল গো আঁখি
অলস পরিহরি ।
নবীন উদ্যমে জাগাও পরাণে,
তরুণ তপন ফুটেছে গগনে ।
স্বপন ভেঙ্গেছে নিশা অবসানে,
আশার পবন বহি ।
জাগিল চেতনা সহস্র কিরণে
নিশার আঁধার সহি ।
উষার বরণী মোদের জননী
সাজায়ে নূতন তরী,
মলিন বদনে চেয়ে মুখপানে
নয়নে নীর ভরি ।
তুলি ক্ষীণ বাহু 'আয় আয় বলে',
ডাকিছেন ধীরি ধীরি ।
প্রভাত উদিল মোদের অঙ্গনে
আঁধার বিদায় করি ।
প্রসাদ পবনে বাহিয়ে তরণী,
নির্ভয় হৃদয়ে নাচাও ক্ষেপনী,
অনুকূল বায়ু বহে' যাবে ধীরে
তরঙ্গ অপসারি,
অটল সাহস কঠোর উদ্যমে
হৃদয় অন্তর ভরি ।
বাড়াও চরণ, থেক না নির্জীব
আর ত সহে না দেরী ।
নূতন আলোকে নয়ন ভাতিল,
আশার সঞ্চার করি ।
বাড়িবে বল অদম্য উৎসাহে
মধ্যাহ্ন তপন ঘিরি ।
প্রভাত উদিল হসিত আননে
স্বপ্ত আঙ্গিনা ভরি ।
ত্যজিয়া ঘুম মেল গো আঁখি
অলস পরিহরি ।

পটাচারার জীবনী।

পটাচারা একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধা রমণী। বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইবার পূর্ব্বে ইঁহার কি নাম ছিল, তাহা জানা যায় না। এই রমণীর জীবনচরিত কথা-গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু হইতে পারে। শ্রাবস্তিনগরের এক শ্রেষ্ঠীর গৃহে ইঁহার জন্ম। যৌবন প্রাপ্ত হইবার পর পটাচারার পিতামাতা উঁহাকে স্বজাতীয় এক ধনী বণিক-কুমারের সহিত বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পটাচারা অন্য জাতীয় এক যুবকের প্রেমে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন বলিয়া বিবাহে অসম্মত হয়েন। যদিও সেই প্রাচীনকালে একালের জাতিভেদের দৃঢ় বন্ধন ছিল না, তবুও পটাচারার পিতামাতা কন্যাকে অন্য জাতীয় দরিদ্র যুবকের প্রতি অনুরক্তা দেখিয়া বিরক্ত হয়েন।

পিতামাতা যখন পটাচারাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ বরগ্রহণে সম্মতি দিলেন না, তখন তিনি গোপনে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দরিদ্র স্বামীর সঙ্গে বহু দূরপ্রদেশে গিয়া বাস করেন। এই দূর দেশে কয়েক বৎসর অবস্থানের পর পটাচারার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মে। বহুদিন পিতামাতাকে না দেখিয়া, এবং বিদেশবাস বিরক্তিকর হওয়াতে পটাচারা স্বামী-পুত্রাদি লইয়া দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন। দৈবের নির্ব্বন্ধে পথে তাঁহার স্বামী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। দুইটি সন্তানই তখন কোলের শিশু; অভাগিনী পটাচারা তখন বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুত্র দুইটিকে লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন। বিপদের উপর বিপদ উপস্থিত হইল। একদিন নবজাত শিশুটিকে বৃক্ষতলে শয়ান রাখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনে একটু দূরে গিয়াছিলেন, এমন সময়ে একটি শ্যেন পক্ষী পুত্রটিকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। তিনি একাকিনী সেই বিজনে অনেক কাঁদিলেন। তাহার পর একদিন একটি নদী পার হইবার সময়ে অন্য পুত্রটিও নদীর জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

পটাচারা তখন একেবারে পাগলিনী হইয়া উঠিলেন। এই শেষ দুর্ঘটনা যেখানে ঘটিয়াছিল, সে স্থান শ্রাবস্তির অনতিদূরে। শ্রাবস্তিনগরে আসিয়া তিনি শুনিলেন, যে তাঁহার পিতা মাতা এবং ভ্রাতা একদিনের ঝড় বৃষ্টির সময়ে ঘর চাপা পড়িয়া এক সঙ্গে প্রাণ হারাইয়াছেন। পটাচারা তখন যথার্থই উন্মাদিনী হইয়া চীৎকার করিয়া আপনার বিয়োগদুঃখের কথা কহিতে কহিতে চলিলেন :—

উভো পুত্তা কালংকতা, পন্থে মহ্যম্ পতিমতো
মাতা পিতা চ ভাতা চ একচিতকস্মিম্ ডয্যরে।

সেই সময়ে ভগবান বুদ্ধদেব শ্রাবস্তিতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার মহিমা এবং নব ধর্ম্মের কথা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। শোকসন্তপ্তা রমণী আপনার শোক-কথা কহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বুদ্ধদেবের চরণতলে গিয়া পড়িলেন। কেবল পটাচারা নহে, কত দুঃখ-শোকসন্তপ্ত পুরুষ রমণী যে শান্তিলাভের আশায় তাঁহার চরণাশ্রয় করিত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধর্ম্মমত আজি আছে কালি নাই; ঐ মতের সূক্ষ্মতা বা ন্যায়ানুমোদিতায় লোক ভুলে না। পবিত্র চরিত্র এবং করুণাময় হৃদয় সকল শ্রেণীর লোকের আকর্ষণের বস্তু। কিসা গোতমী নামে অন্য একজন থেরীর জীবনেও জানা যায়, যে সে পুত্র হারাইয়া লোকমুখে শুনিয়াছিল, যে বুদ্ধদেব পুত্রহারাকে পুত্র দান করেন। সে গিয়া বুদ্ধদেবকে কাঁদিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিল, "প্রভু আমাকে এমন ঔষধি দাও, যাহা দিয়া মৃত পুত্রের জীবন দান করিতে পারি।" বুদ্ধদেব কহিলেন, "তুমি এমন কোন এক গৃহস্থের গৃহ হইতে সর্ষপ লইয়া আইস, যাহার গৃহে স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা, প্রভৃতি কেহ কখনো মরে নাই; আমি সেই সর্ষপ দিয়া ঔষধি প্রস্তুত করিয়া দিব।"

কিসা গোতমী বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে, বুদ্ধদেব তাঁহাকে যথার্থই এমন পরমাশ্চর্য্য ঔষধ দিয়াছিলেন, যে তাহার বলে কিসা গোতমী থেরী পদ প্রাপ্ত হইয়া পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় ধন লাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের যে সকল মধুর বচন শুনিয়া পটাচারা

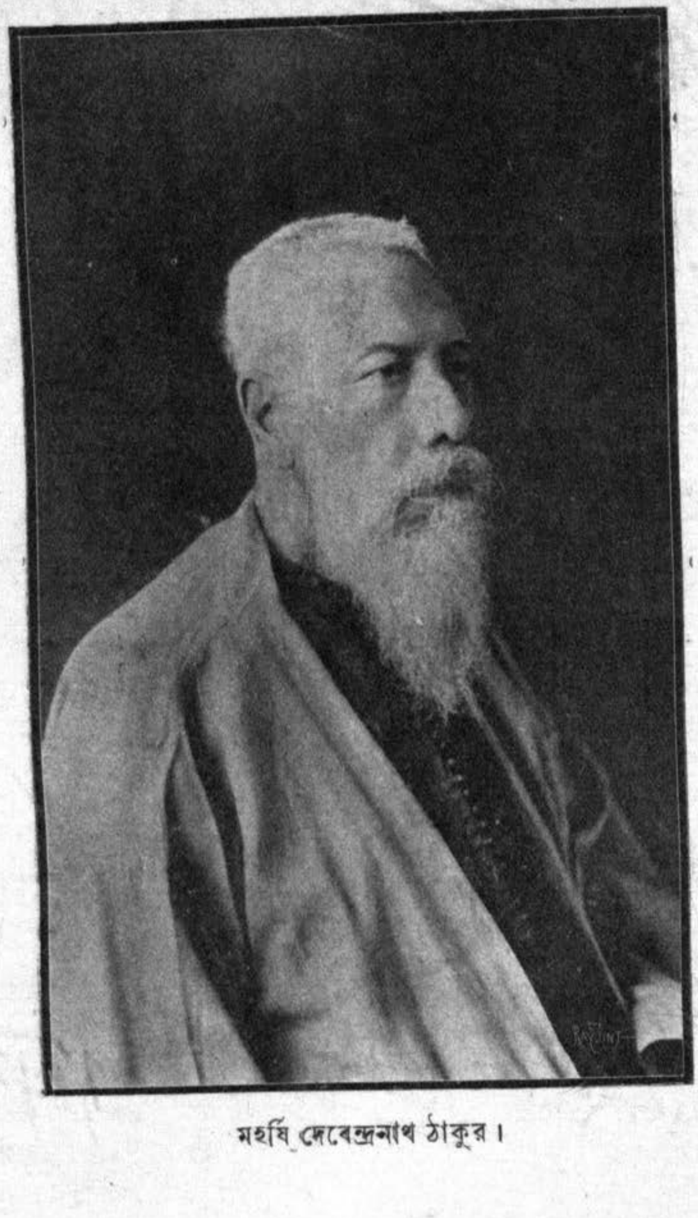

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সকল শোক দুঃখ ভুলিয়াছিলেন, তাহার একটি বচন ধম্মপদ গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট আছে ঃ—

যো চ বস্সসতং জীবে অপস্সম্ উদয়ব্বয়ং
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্সতো উদয়ব্বয়ং

অর্থ—জন্ম এবং মৃত্যু না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকা অপেক্ষা উহার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া একদিন জীবন ধারণ করায়ও ফল আছে।

পটাচারা যখন থেরী হইলেন, তখন শত শত শোকাকুলা রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া সান্ত্বনা লাভ করিত। যাহারা বুদ্ধদেবের চরণে দুঃখ সমর্পণ করিতে আসিত, তাহাদের মধ্যে অনেক রমণীই পটাচারার শিষ্যা হইয়া শোক দুঃখ ভুলিত। পিটক গ্রন্থে পাওয়া যায়, যে একবার পটাচারা ৫০০ একত্র সমবেত রমণী-মণ্ডলীতে উপস্থিত হইয়া এমন ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, যে সকলেই বুদ্ধদেবের নবধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। কোন দেশের ধর্ম্মসমাজের ইতিহাসে বৌদ্ধধর্ম্মদীক্ষিতা থেরী (স্থবিরা বা জ্ঞানবৃদ্ধা) দিগের মত প্রভাবসম্পন্না রমণীবর্গের কথা পাওয়া যায় না।

থেরীগাথায় পটাচারা-রচিত যে গাথা কয়েকটি আছে, তাহার প্রথম গাথাটি এই ঃ—

নঙ্গলেহি কসম্ খেত্তং বীজানি পবপম্ ছমা
পুত্তদারানি পোসেন্তি ধনং বিন্দন্তি মানবা। (১১২)

এই প্রাকৃত এত সহজ, যে উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ বা ব্যাখ্যা দিবার প্রয়োজন হইল না। সমগ্র থেরী-গাথা এইরূপ সরল প্রাকৃত ভাষায় রচিত। পটাচারার জীবনচরিত্র সহ, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের রমণী-রচনার একটুকু নমুনা তুলিয়া দিলাম। আশা করি পালি বলিয়া ভয় না পাইয়া সংস্কৃতজ্ঞ পাঠিকারা রমণীকুল-গৌরব থেরীগণ-বিরচিত থেরীগাথা পাঠ করিবেন। ঐ গ্রন্থে পটাচারার মত আরও ৭২ জন থেরীর গাথা আছে। ধম্মপাল প্রণীত পরমৎথ-দীপনী টীকায় ঐ থেরীগণের জীবনচরিত সরল প্রাকৃত ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

অভিমন্যুবধ।

অভিমন্যুবধ মহাভারতের একটি অতিশয় শোকাবহ ঘটনা। দুর্য্যোধনাদি অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে নিহত করিয়া চিরদিনের জন্য বীরেন্দ্র-সমাজে নিন্দিত হইয়া রহিয়াছেন। অভিমন্যুবধ-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। আমাদের দেশে অভিমন্যুর বৃত্তান্ত মূল মহাভারত অপেক্ষা অধিকতর শোকাবহ রূপে প্রচলিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের সাধারণের বিশ্বাস এই, যে অভিমন্যু যখন অন্যায় যুদ্ধে নিহত হন, সে সময় তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন, যে দ্রোণ-নির্ম্মিত চক্রব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর প্রতি ঐ কার্য্যের ভার দিলেন। অভিমন্যু সপ্তরথী কর্ত্তৃক নিহত হইলে ;—

"কুরুসৈন্যে হইল মহা বাদ্য কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম আদি যোদ্ধাগণ॥

যুধিষ্ঠিরাদি শিবিরে আসিয়া অভিমন্যুর শোকে কাতর হইয়া রহিলেন। এমন সময় ব্যাসদেব পাণ্ডব শিবিরে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবগণ ব্যাসদেবকে যথোচিত পূজা করিলেন। ব্যাসদেব বলিলেন, "তোমরা অভিমন্যুর জন্য শোক করিও না। জন্মিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। চন্দ্র গর্গমুনির অভিশাপে অভিমন্যুরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ধরাধামে ষোল বৎসর মাত্র তাঁহার থাকিবার কথা। সে কাল পূর্ণ হইয়াছে, তাই অভিমন্যু শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় চন্দ্রলোকে গিয়াছেন।" তার পর অর্জ্জুন শিবিরে আসিয়া অভিমন্যুর নিধন-সংবাদ শ্রবণে অনেক শোক করিলেন ও পরদিবস জয়দ্রথ-বধের জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। কাশীরাম দাসে এই পর্য্যন্ত।

যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালারা অভিমন্যুবধ নাটকে

তাঁহাদের মামুলি প্রথা মত, যুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে পত্নী উত্তরা ও মাতা সুভদ্রার নিকট অভিমন্যুকে বিদায় লইতে পাঠাইয়াছেন ও তদুপলক্ষে অনেক করুণ সুরের গান ও নাকি সুরের দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করাইয়াছেন। অভিমন্যু যে যুদ্ধকালে ষোল বৎসর বয়সের ছিলেন এবং বিরাট-কুমারী উত্তরার বয়স যে অভিমন্যু অপেক্ষা কম ছিল, এবিষয়ে উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মতের আশ্চর্য্য একতা দেখা যায়।

প্রতিভাশালী কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ও যে এ বিষয়ে কাশীরাম দাস এবং যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালাদিগের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহাই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়।

নবীনচন্দ্রের "কুরুক্ষেত্র" কাব্যে অভিমন্যুবধ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার মনোহারিত্বে, ছন্দের ঝঙ্কারে, ভাষার লালিত্যে, "কুরুক্ষেত্র" বঙ্গভাষায় অতি আদরের সামগ্রী। এই শোককাব্যে কবিবর যে মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সমীচীনতা সম্বন্ধেও এস্থলে কোন কথা বলিতেছি না। অভিমন্যু ও উত্তরাকে যে কবিবর কি ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

নবীনচন্দ্রও লিখিয়াছেন, যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর বয়ঃক্রম ষোল বৎসর। অভিমন্যু উত্তরার নিকট বিদায় লইতে আসিয়া বলিতেছেন :—

"উত্তরে! কি ভাগ্য তোর! কি ভাগ্য আমার!
ষোড়শ বৎসর মম; সেনাপতি-পদে
করেছেন ধর্ম্মরাজ এদাসে বরণ
আজি রণে।"

ষোল বৎসরে কাহারও যে সেনাপতির পদ লাভ করা অসম্ভব, এমন কথা অবশ্য কেহই বলিতেছে না, এবং এই "কুরুক্ষেত্র" কাব্যে যদি অভিমন্যুর সহিত উত্তরার কাহিনী বর্ণিত না হইত, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও চলিত, কারণ, "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।" পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে রাম মিথিলার যজ্ঞ রক্ষা ও হরধনু ভঙ্গ করেন। আকবর চৌদ্দ বৎসর বয়সে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে যশোলাভ করেন। কিন্তু কবিবর নবীনচন্দ্র "কুরুক্ষেত্র" কাব্যকে অধিকতর শোকাবহ করিবার জন্যই বোধ হয় ইহার সহিত উত্তরার প্রসঙ্গ করিয়াছেন। "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের দ্বিতীয় স্বর্গে অভিমন্যু ও উত্তরাকে প্রথম দেখিতে পাই।

"রণ-ঝটিকায় মত্তবিক্ষোভিত
কুরুক্ষেত্র-গর্ভে শোভার আধার
শোভিছে শিবির—শান্তির ত্রিদিব
প্রীতিপূর্ণ—অভিমন্যু উত্তরার।"

সেই শিবিরে বসিয়া দিনের বেলায় অভিমন্যু একমনে ভীষ্মের শরশয্যা চিত্র আঁকিতেছেন। কবি অভিমন্যু ও উত্তরার বয়স সম্বন্ধে এস্থলে বলিতেছেন যে,—

"কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ!"
"কহিছে যৌবন—"উত্তরা যুবতী",
কৈশোর কহে—'না, কিশোরী এখন'।"

এই গেল উত্তরা সম্বন্ধে। অভিমন্যু সম্বন্ধে বলিতেছেন যে,

"এই বীরত্বের মহারঙ্গ ভূমে
কৈশোর যৌবন করিছে কি রণ!
কহিছে কৈশোর 'এখনো কিশোর'।
'মিথ্যাকথা' গর্ব্বে কহিছে যৌবন।"

অভিমন্যুকে এক মনে ছবি আঁকিতে দেখিয়া উত্তরা 'চুপে চুপে আসি আসন পশ্চাতে' কৌতুক করিয়া বলিলেন,

"কিহে বীরবর! আজি যে সকালে
রণক্ষেত্র হতে দিলে পিট্টান?
জীবহত্যা রঙ্গে হ'ল কি অপ্রীতি?
কত শত আজি দিলে বলিদান?"

অভিমন্যু উত্তর করিলেন যে, "হাঁ, এক রকম পিট্টানই বটে",

"যুঝিতে যুঝিতে কি মনে পড়িল,
কার হাসি টুকু, কার মুখ খানি।
"দেখি দেখি"—কহি সুকোমল করে
আদরে উত্তরা তুলিলা মুখ,

হাসি অভিমন্যু কহিলা আদরে—
"এই মুখ বটে, এ হাসি টুক"
অধরে অধরে হইল মিলিত;
অধরে অধর রহিল গাঁথা।
অধরে অধর কি সুধা ঢালিল
নিমীলিত চারি নয়ন-পাতা।"

অতঃপর অভিমন্যু উত্তরাকে কহিলেন যে তাঁহার এই
"ইচ্ছা, থাকি প্রেম অনন্ত-স্বপনে
ওই বুকে মরি, জাগি না আর।"

ইহার পর এই প্রেম অভিনয়ের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আছে, কুতূহলী পাঠক "কুরুক্ষেত্র" পাঠ করিয়া দেখিবেন।

"কুরুক্ষেত্রের" কবি বলিতেছেন যে অভিমন্যু মহাবীর, যদিও তাঁহার বয়ক্রম ষোড়শ বৎসর তথাপি বীরত্বে তিনি অতুল, কিন্তু যুদ্ধে অভিমন্যুর মন চলে না। তার পরে মাতা সুভদ্রার নিকট গীতার উপদেশ পাইয়া যুদ্ধে অভিমন্যুর মন বসিল; তার পরদিনই মহাযুদ্ধ করিয়া তিনি নিহত হইলেন।

আমাদের দেশে পুরাকালে সমাজের প্রথম তিন শ্রেণীর লোকের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে সর্ব্ব প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে এই ব্রহ্মচর্য্য বিশেষ রূপে পালন করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান সময়ে ব্রহ্মচারীকে কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা ও অধ্যয়নে নিরত থাকিতে হইত। অতঃপর অধ্যয়নশেষে গুরুর আদেশ লইয়া কেহ বা বিবাহাদি করিয়া গৃহী হইতেন, কেহ বা চিরকালের জন্ম ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিতেন। সোজা কথায় বলিতে গেলে কথা এই দাঁড়ায়, যে মানব জীবনের প্রথম যে কয়েক বৎসর শিক্ষায় অতিবাহিত করা হয়, উহা ব্রহ্মচর্য্যের কাল। পূর্ব্বকালে এবিষয়ে যত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল, এখন এদেশে সে নিয়মের ততোধিক শিথিলতা লক্ষিত হয়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের দিকে লোকের দৃষ্টি একেবারে নাই বলিলেই হয়। ছাত্রজীবনে ছাত্র সংসারত্যাগী যোগীর ন্যায় অনন্যমনে অধ্যয়নাদিতে লিপ্ত থাকিবেন, সাংসারিক চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পাইতে পারিবে না;—স্ত্রীবিষয়ক চিন্তা যে তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে, একথা বলাই বাহুল্য, কারণ ঐ বিষয়ের পবিত্রতা রক্ষাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ। বাংলাদেশে এখন আর এনিয়ম খাটে না। এখন বাঙ্গালী ছাত্র বিদ্যা শেষ করিবার পূর্ব্বে প্রায়শঃই পুত্রকন্যার পিতার পদবী লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে পড়া কামাই করিয়া নবপরিণীতা বধূর সহিত আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য সময়ে অসময়ে শ্বশুরালয়ে গমন করেন একথাও অনেকে জানিতে পারেন। যে জাতির ছাত্রদিগের মধ্যে এই প্রথার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সে জাতি হীনবীর্য্য ও উদ্যমশূন্য হইয়া পড়িবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। অতএব কবিবর নবীনচন্দ্র যদি ষোল বৎসর বয়সের অভিমন্যুকে দিনের বেলায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনিয়া কিশোরী বা যুবতী পত্নীর সহিত তাঁহার প্রণয়-সংগ্রাম বাধাইয়া দিয়া থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি? ইহাতেও কবিবরের তৃপ্তি হয় নাই। তিনি অভিমন্যু ও উত্তরাকে অতি তরলমতি বালকবালিকার ন্যায় চিত্রিত করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। প্রমাণ,—"কুরুক্ষেত্র" কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ।

অভিমন্যুকে যুধিষ্ঠির সেনাপতি পদে বরণ করিলে পর, নবীন বাবুর অভিমন্যু, যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালাদের নায়কের মত, প্রথমে পত্নী উত্তরার নিকট বিদায় লইতে আসিলেন, উত্তরাও কিছুতেই স্বামীকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিলেন, অভিমন্যুর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। অভিমন্যু উত্তরাকে শান্ত করিয়া মাতা সুভদ্রার নিকট বিদায় লইতে গেলেন, সুভদ্রা অবশ্য বীরকন্যা, বীরপত্নী ও বীরজননীর মত কথা কহিলেন, বিনা আপত্তিতে পুত্রকে যুদ্ধে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সুলোচনা অভিমন্যুর হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি আজ কোন মতেই অভিমন্যুকে যুদ্ধে যাইতে দিবেন না। অভিমন্যু অনেক করিয়া সুলোচনাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে তিনি না গেলে পাণ্ডবদের মহা অনর্থপাত হইবে। কিন্তু সুলোচনা কোন কথা মানিতে চাহেন না। অভিমন্যু মহা মুস্কিলে পড়িলেন। এমন সময়:—

"ঘোর হাহাকার
উঠিল পাণ্ডব সৈন্যে,—'কুমার! কুমার!
হায়! হায়! আজি দ্রোণ করিবে সংহার
সমস্ত পাণ্ডব সৈন্য।' নক্ষত্রের বেগে
ছাড়াইয়া ধাত্রীকর ছুটিল কুমার,
বাজিল সমর বাদ্য বিজয় ঝঙ্কার।
সুলোচনা ভূমিতলে হইলা পতিতা,
বন্ধন বিহীনা স্বর্ণ-প্রতিমা মূর্চ্ছিতা।"

এইরূপ চিত্র যাত্রা ও থিয়েটারের দর্শকবৃন্দের নিকট খুব ভাল লাগিলেও "কুরুক্ষেত্রের" মত কাব্যে স্থান পাইবার নিতান্ত অযোগ্য এবং প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে কখনই এরূপ আজগুবী ব্যাপার সংঘটিত হয় না। অভিমন্যুকে যুধিষ্ঠির বিপদে পড়িয়া অনন্যোপায় হইয়া সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, সেই সেনাপতি তখন পত্নীর ও মাতার নিকট বিদায় লইতে গেলেন, আর তাঁর সৈন্যগণ কর্ণধার বিহীন তরণীর আরোহীদিগের ন্যায় রণসাগরে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। চীৎকারের পর চীৎকার করিয়া ডাকিবার পর তবে সেনাপতি ছুটিয়া বাহির হইলেন। এযেন জামালপুরের লোকো (loco) অফিসের কেরাণী বাবু; চোকে মুখে নাকে তপ্ত ডালভাত দিতে দিতে গৃহিণীর ছুটা আবদার শুনিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে;—এমন সময় অফিসের ভোমা বাজিয়া উঠিল; অমনি কেরাণী বাবু নক্ষত্রবেগে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া—'নদী যথা ধায় সিন্ধু পানে'—অফিস অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

কাশীরাম দাস, যাত্রা ও থিয়েটারওয়ালারা এবং নবীন বাবু অভিমন্যুকে যুদ্ধকালে ষোল বৎসরের এবং তাঁহার পত্নী উত্তরাকে তদপেক্ষা অল্প বয়সের বলুন না কেন, মূল মহাভারতে এরূপ কথা নাই। বরং একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে অভিমন্যুর বয়স ষোল বৎসর কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

মূল মহাভারতের বৃত্তান্ত এইরূপ। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। অতি সমারোহে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ হইল। কৃষ্ণ-বলরাম-প্রমুখ যাদবগণ সুভদ্রার বিবাহ উপলক্ষে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। বিবাহান্তে বলদেব প্রভৃতি যাদবগণ ফিরিয়া গেলেন, কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে রহিলেন। পাণ্ডবদের কাল অতিশয় সুখে কাটিতে লাগিল। কিছুকাল পরে সুভদ্রা এক সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। অর্জ্জুনের এই পুত্রের নাম হইল অভিমন্যু। কৃষ্ণ জন্মাবধি অভিমন্যুর সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। অভিমন্যু অর্জ্জুনের নিকট চতুষ্পাদ দশবিধ দিব্য ও মানুষিক ধনুর্ব্বেদ আনুপূর্ব্বিক শিক্ষা করিয়া যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্রের আদান ও মোক্ষণ বিষয়ে অভিমন্যুকে আত্মতুল্য ও সর্ব্বাংশে কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে দ্রৌপদীও পঞ্চ স্বামী হইতে পঞ্চ পুত্র লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর পুত্রেরা এক এক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিলেন। সুচরিত ও সুব্রতধারী দ্রৌপদীর পুত্রগণ—বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া অর্জ্জুনের নিকট দিব্য ও মানুষিক সমুদয় বাণ ও অস্ত্র শিক্ষা করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা দেবকুমার সদৃশ আত্মজগণে পরিবৃত হইয়া পরম সুখে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার পর খাণ্ডব বন দাহ হইল। ময় কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের জন্য সভা নির্ম্মিত হইল। জরাসন্ধ নিহত হইলেন। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব দিগ্বিজয় করিয়া ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। রাজসূয় যজ্ঞে সমবেত নৃপতিবর্গকে সমাদৃত করিয়া যুধিষ্ঠির বিদায় দিলেন। ঐ সকল নৃপতিগণকে তাঁহাদের অধিকার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যুধিষ্ঠির তাঁহার ভ্রাতাগণকে অনুমতি করিলেন। তদনুসারে অর্জ্জুন দ্রুপদরাজের অনুগামী হইলেন। সহদেব অশ্বত্থামা-সমভিব্যাহারী গুরু দ্রোণাচার্য্যের পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন। নকুল সপুত্র সুবল নৃপের সহিত গমন করিলেন। সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ যাবতীয় পার্ব্বতীয় মহারথ ও প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয়গণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তার পর পাশাখেলায় যুধিষ্ঠির পরাজিত

হইয়া বনে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ও একবৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটাইলেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর অন্তে অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। উত্তরা বিরাট-কুমার উত্তরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, কনিষ্ঠা নহেন। তাহার পরই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগ হইল। কৃষ্ণকে হস্তিনায় পাঠাইবার সময় দ্রৌপদী বলিলেন, "যদি ভীমার্জ্জুন নকুল ও যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকেন তাহাতেও আমার ক্ষতি নাই। আমার মহাবীর্য্যশালী পুত্রগণ অভিমন্যুকে সম্মুখে করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে।" অভিমন্যু দ্রৌপদীর পুত্রগণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। রাজসূয় যজ্ঞকালে তাঁহাদের এমন বয়স হইয়াছিল, যে যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের প্রতি পার্ব্বতীয় মহারথগণকে তাঁহাদের অধিকার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার ভার দিলেন। ইহার পর অন্ততঃ তের বৎসর অতিবাহিত হইল। তথাপি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর বয়ঃক্রম কেমন করিয়া ষোল বৎসর হয়, একথা বুঝা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মূল মহাভারতের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে সহদেবের পুত্র অভিমন্যু অপেক্ষা অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের ছোট, এমতাবস্থায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর বয়স ষোল বৎসর, রাজসূয় যজ্ঞের সময় অভিমন্যু তিন বছরের শিশু। তখন নকুল সহদেবের পুত্র শতানীক ও শ্রুতসেনের জন্ম সম্ভবে না। অথচ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, "বাপু সকল, পার্ব্বতীয় মহারথগণকে তাঁহাদের অধিকার পর্য্যন্ত রাখিয়া আইস।" কোন্ কথা মানিব? মূল মহাভারত মানিব, না কাশীরাম দাস, যাত্রাথিয়েটার ওয়ালাগণ এবং নবীন বাবুকে মানিব?

কাশীরাম দাসের মতে অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শুনিয়া যুধিষ্ঠির যা করিলেন, পূর্ব্বে বলিয়াছি;—মহাভারত-কার সে স্থলে যুধিষ্ঠিরকে কি প্রকার আঁকিয়াছেন দেখুন। "অভিমন্যু নিহত হইলেন দেখিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে বীরগণ, সমর-বিশারদ অভিমন্যু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া শত্রু হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তোমরা স্থির হও, ভয়ে পলায়ন করিও না। আমরা শীঘ্রই বিপক্ষগণকে পরাঙ্মুখ করিব।' যুধিষ্ঠিরের কথায় আশ্বাসিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য পুনর্ব্বার ভীষণ ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।"

পরবর্ত্তী লেখকদিগের হস্তে পড়িয়া মূল মহাভারতের অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলির যে কি দশা হইয়াছে; আজ সে বিষয়ের আলোচনা করিলাম না। অভিমন্যু-উত্তরা সম্বন্ধে আর কয়েকটি কথা বলিব।

কাশীরাম দাস শ্রুতমাত্র পয়ার রচিয়া লেখেন, যাত্রাওয়ালাদের বিদ্যা ও বোধ হয় কাশীরামের মহাভারত; কিন্তু নবীন বাবু সম্বন্ধে একথা কিছুতেই খাটে না। নবীন বাবু যে মূল মহাভারত পড়েন নাই, একথা কেহ বলিতে পারিবেন না। তথাপি তিনি মহা-ভারতের চরিত্রগুলিকে এমন বিকৃত করিলেন কেন? তাঁহার "কুরুক্ষেত্র" কাব্যের অন্য চরিত্রগুলির কথা এখন থাকুক, তিনি অভিমন্যু-উত্তরাকে অমন করিয়া আঁকিলেন কেন? তাঁহার কৃষ্ণভক্তিপূর্ণ "কুরুক্ষেত্রে" বিলাস-কলার এত ছড়াছড়ি করিলেন কেন? "কবয়ঃ নিরঙ্কুশাঃ" হইলেও জাতীয় সম্পত্তিগুলি নষ্ট করিবার অধিকার তাঁহাদের আছে কি?

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সম্বন্ধে বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিয়াছেন, যে উহা "অশ্লীলতার চারুশিল্প।" "সাহিত্য" পত্রের সুলেখক বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ "বিদ্যাসুন্দর" সম্বন্ধে হীরেন্দ্র বাবুর মন্তব্য পাঠ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে "উহা কি কেবলই 'অশ্লীলতার চারুশিল্প', উহা কি গোবিন্দ-গীতি নহে?" সেইরূপ অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, "নবীন বাবুর কুরুক্ষেত্রে কি কেবলই বিলাসকলা রহিয়াছে, উহাতে কি অমৃতময় কৃষ্ণকথা নাই? দুই-ই আছে। ভক্তকবি জয়দেব গোস্বামী লিখিয়াছেন যে,—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলং।
মধুর-কোমলকান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।"

জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী পাঠে "হরিশরণে সরসং মনঃ" ই-বা কয়জনের হয়, আর "বিলাসকলাস্থু"ই বা কয়জন কুতূহলী হয়? অথচ "গীত গোবিন্দ" সাধারণের অবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। "কুরুক্ষেত্র" সাধারণের বোধ্য বাংলাভাষায় লিখিত। উহা পাঠে নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণভক্তিতে পাঠকের হৃদয় আপ্লুত হউক আর নাই হউক, অনেকেই যে "বিলাসকলাস্থু" কুতূহলী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরের দেশে বিলাস-কলার চিত্র অনেকেই আঁকিয়াছেন, ঐ সুরে অনেকেই গাহিয়াছেন, এখন আর সে নিদ্রাজনক গান ভাল লাগে না, শুনিতে শুনিতে কাণ ঝালা পালা হইয়া গিয়াছে। আমাদের নিতান্তই দুর্ভাগ্য, যে আমাদের দেশের প্রতিভাশালী কবিগণ এইরূপে তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। এসব দেখিয়া শুনিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, "কি মোদের করমে লেখি, শীতল বলিয়া ও চান্দ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।*

জগতে দুই শ্রেণীর সাধক দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর সাধক বড়ই অসহিষ্ণু, তাঁহাদের মনে কোনও ভাবের উদ্রেক হইলে তাহার চরিতার্থতার জন্য তাঁহারা এমন ব্যাকুল হইয়া পড়েন, যে তাঁহাদের দিখিদিক্ জ্ঞান থাকে না। ইঁহাদের ব্যাকুলতা প্রসংশনীয়। কিন্তু ব্যাকুলতাই ধর্ম্মলাভের একমাত্র উপকরণ নহে। যে ব্যাকুলতার সঙ্গে সহিষ্ণুতা নাই, ভাল মন্দের বিচার নাই, ভবিষ্যতের ফলাফল চিন্তা নাই, সে ব্যাকুলতা মানুষকে অধিকাংশ সময় কেবল বিপথেই লইয়া যায়। ধর্ম্মজীবন বাজী-করের বাজী নয়, যে এই বীজ পুঁতিলাম, অমনই বীজ অঙ্কুরিত হইল, দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে শাখা-পল্লবিত বৃক্ষ ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। মানব-জীবনের উন্নতি অতি ধীর। যে বস্তু যত উন্নত, উন্নতির দিকে তাহার গতিও মন্থর, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সুতরাং ধর্ম্মজীবন লাভ রাতারাতির ব্যাপার হইতে পারে না। যাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন তাঁহারা ভেল্কী বাজীর মত এক হাওয়ায় কোথা হইতে আসেন, আর এক হাওয়ায় কোথায় চলিয়া যান। তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় না। ইঁহারা সাধনের পরিশ্রমবিমুখ। ধীরে ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে যে সহিষ্ণুতা, যে সাধন, যে পরিশ্রমের প্রয়োজন, ইঁহারা তাহা ব্যয় করিতে সম্পুর্ণ অক্ষম। তাই ইঁহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত, যদি কোনও গুরু দৈব বলে ইঁহাদের মুক্তি সাধন করিয়া দিতে পারেন। আবার যখন যে বস্তুর দরকার পড়ে, বাজারে সে বস্তু তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই কিছুদিন পূর্ব্বে ৫৲ টাকাতেই "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ব্রহ্ম হৃদ্দেশে দোদুল্যমান" দেখা গিয়াছিল। যখন কতক-গুলি লোক বিনা সাধনে, বিনা জ্ঞানালোচনায় হঠাৎ ব্রহ্মদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, অমনি সংবাদ-পত্রে ব্রহ্মদর্শনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। যখন হৃদয়ে ব্যাকুলতা জাগ্রত হয় তখন ধীর ভাবে অগ্রসর হইলে ফল ফলে, নতুবা বিচারবিহীন হইয়া যা'তা'র পশ্চাতে ছুটিলে বিনাশ পাইতে হয়। ক্ষুধাতুর ক্ষুধায় কাতর হইয়া যেমন যা পায় তাই খায়, শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ধর্ম্মজগতের এই ক্ষুধাতুরদের অবস্থাও তাই। ইঁহারা কখনও ধর্ম্মের শক্ত ভিত্তি প্রাপ্ত হন না। যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া পরীক্ষা প্রলোভনে জয়লাভ করা যায়, সে ভিত্তি ইঁহাদের নাই। দুদিনের জন্য ভেল্কী বাজীর মত ইহারা কোথা হইতে আসেন, আবার পরীক্ষা প্রলোভনের তাড়নে কোথায় চলিয়া যান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সাধক ছিলেন না। মহর্ষি সেই শ্রেণীর সাধক, যাঁহারা আত্মপ্রতিষ্ঠ, আত্মার আলোকে ধীরে ধীরে অগ্রসর। ইঁহাদের ব্যাকুলতা কিছু কম নয়, কিন্তু তাহা সহিষ্ণুতাবর্জ্জিত নহে। মহর্ষির প্রাণ

* মহর্ষির প্রথমবার্ষিক শ্রাদ্ধদিনে কটক ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ।

যখন ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তিনি পূর্ব্বোক্ত সাধকদিগের ন্যায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিলেন না, আত্মার আলোকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অথচ তাঁহার ব্যাকুলতার তুলনা হয় না। সে কিরূপ ব্যাকুলতা যাহাতে মানুষ মনে করে "আমি আর বাঁচিব না," যাহাতে সূর্য্যরশ্মি কাল বলিয়া মনে হয়। মনের এই উদ্দাম ব্যাকুলতার মধ্যেও মহর্ষি সহিষ্ণুতা হারাইলেন না। মহর্ষির জীবনে ব্যাকুলতা ও সহিষ্ণুতার মণিকাঞ্চন যোগ হইল। যে ব্যাকুলতায় আর বাঁচিব কিনা এই সন্দেহ আনিতেছে সেই জীবননাশকর ব্যাকুলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সঙ্গে মহর্ষি বলিতেছেন যে, "আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য—অন্ধ বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে।" যা তা খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিব না, আসল না পাইয়া নকল লইয়াই পরিতৃপ্ত হইব না, ইহাতে জীবন যায় যাক্, থাকে থাক্, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবনলাভের মূল ভিত্তি, ইহাই প্রকৃত পথ। মহর্ষি এই পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আত্মার আলোকে যতটুকু পাই, তাই আমার, তদতিরিক্ত যাহা কিছু, সব শুনা কথা, পরীক্ষা প্রলোভনে তাহা আমার সহায় হইতে পারে না। তাহা পাখীর 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি, কিন্তু বিড়াল দেখিলেই ট্যাঁ ট্যাঁ। যাঁহারা আত্মার আলোকে, জ্ঞানালোকে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করেন তাঁহাদেরই লাভ খাঁটি লাভ, তাঁহাদেরই বিশ্বাস পরীক্ষা প্রলোভনে সহায়। ইঁহারা জীবনের পরীক্ষিত সত্যে বিশ্বাসী, সুতরাং পরীক্ষায় অটল। ইঁহাদেরই "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি"। নতুবা শুনা কথায় বিশ্বাস যে বিশ্বাস নামের অযোগ্য, তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়া একটা 'লাল পাগড়ী' দেখিলেই হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়, কেন না, জানি যে ঐ লাল পাগড়ীর পশ্চাতে একটা সমগ্র সাম্রাজ্যের সকল শক্তি বর্ত্তমান। ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, সুতরাং এ বিশ্বাস খাঁটি বিশ্বাস। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ঈশ্বর বিশ্বাস কিরূপ? ঐ পাখীর 'রাধাকৃষ্ণ' বুলি, শুনিয়া বিশ্বাস। তাই আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বর পুণ্যময়, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, অথচ পাপচিন্তা ও পাপবাসনা হৃদয়ে লইয়া সুখে দিনরাত আহার বিহার করিয়া বেড়াই। আমাদের বিশ্বাস পৌনে ষোল আনাই শুনা কথা, গতানুগতিকতার ফল। তাই বিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া উপাসনা করিয়াও কোন ফল ফলিতেছে না। কিন্তু যাঁহারা আত্মতত্ত্বের দীপ লইয়া অগ্রসর হন, জ্ঞানালোকে যেটুকু পান সেইটুকুই সাধন করিয়া অগ্রসর হন, তাঁহাদের জীবন অন্যরূপ। 'সত্যং' বলিতে না বলিতেই ব্রহ্মসত্তার জীবন্ত আবির্ভাবের প্রভাবে মহর্ষির সমস্ত কেশ দণ্ডায়মান হইত। কেন না, মহর্ষির পণ ছিল, প্রাণ যায় যাক্, তবুও জ্ঞানালোক ছাড়িয়া অন্ধবিশ্বাসের ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন না। কিন্তু এ পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই কণ্টকাকীর্ণ, খুব সহিষ্ণু না হইলে এ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া কেহ ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। যাঁহার ব্যাকুলতা আছে, সহিষ্ণুতা নাই, তাঁহার ব্রহ্মলাভের অর্দ্ধেক উপকরণ সংগৃহীত হয় নাই, তাঁহারা এ পথকে ঢেঁকির কচকচি মনে করতঃ নিশ্চয়ই ব্যাকুলতার স্রোতের টানে পড়িয়া ভাবুকতার পাথারে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন। মহর্ষি যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথই সুপথ, "আমার চেষ্টা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য—অন্ধ বিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা আরও বাড়িতে লাগিল, এক একবার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না।"

এ পথ সহিষ্ণুতার পথ, ধীর আত্মচিন্তার পথ। এ পথে কিরূপে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা মহর্ষি ইঙ্গিতে এক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন। "এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের যোগে বিষয় জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও ত জানিতে পারি। দর্শন, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও মননের সহিত দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, ঘ্রাতা ও মন্তা এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়, শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি। আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে

এই আলোকটুকু পাই। যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটা রেখা আসিয়া পড়িল। বিষয়-বোধের সহিত আপনাকে আপনি জানিতে পারি ইহা বুঝিলাম। পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্ব সংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে, আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত হইতেছে। ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটী লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য ? জড়ের ত লক্ষ্য হইতে পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনাবান্ পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্য পান করে, ইহা কে তাহাকে শিখাইয়া দিল। তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল ? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎ সংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল, তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।" উদ্ধৃত অংশটি দীপোপম আত্মতত্ত্বের আলোকে ব্রহ্মতত্ত্বলাভের একটি ইঙ্গিত মাত্র। এই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পরমাত্মার অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের অন্য পথ নাই, অন্য উপায় নাই। ধর্ম্মলাভের অন্য দশটা উপায় থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মলাভের এই এক মাত্র পন্থা।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্ব্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥

দীপস্বরূপ আত্মজ্ঞানের সাহায্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরম পুরুষকে জানিয়া সকল পাশ হইতে মুক্ত হন। কোন্ অতীতকালে ঋষিহৃদয়ে এই সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা কেহ নির্ণয় করিয়া বলিতে সমর্থ নহে। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে মহর্ষির জীবনে যে তাহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে তাহা আমরাও অনুভব করিতেছি। মহর্ষি আত্মতত্ত্বের দীপ লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিলেন, প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাই একটী একটী করিয়া তাঁহার সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়াছিল, তিনি সকল পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

প্রথম, ভোগ বিলাসের পাশ। প্রিন্স দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সে পাশটি কত গুরুতর, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু মহর্ষি ঋষিনির্দ্দিষ্ট আত্মতত্ত্বরূপ শাণিত অস্ত্রহস্তে অগ্রসর হইতেছিলেন, কোন পাশই তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। শুদ্ধোধনের ন্যায় পুত্রের গতিরোধার্থ দ্বারকানাথও আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু এবারও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। বৈরাগ্য বিলাসের উপর জয়লাভ করিল। দ্বারকানাথের বাগান বাড়ীতে বাইনাচ ও গানবাজনার এক জম্‌কাল মজ্‌লিসের আয়োজন হইয়াছে। সকলকে অভ্যর্থনা করা জ্যেষ্ঠপুত্র দেবেন্দ্রনাথের একটা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, কিন্তু সেই দিনই তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন। সুতরাং "আমরা সেই দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব, অতএব এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি আর বাগানের মজ্‌লিসে যাইতে পারিলাম না।" তার পর মহর্ষি পিতাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতেছেন যে, "এই ঘটনাতে আমার মনের ঔদাস্য তাঁহার নিকট বিশেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবধি তিনি সতর্ক হইলেন যে, আমি বেদান্ত পড়িয়া, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া, না খারাপ হই। তাঁহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পদ ও মানমর্য্যাদাতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও যশস্বী হই। কিন্তু তিনি আমার মনে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। তবুও তো তিনি আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারেন নাই। তখন আমার হৃদয় যে বলিতেছে—'তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ', তখন যে আমি উপনিষদে এই কথা পড়িয়াছি ;—'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ'। আর কি কেহ বিষয়েতে আমাকে ডুবাইতে পারে ? আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে ?"

দ্বিতীয়, মানমর্য্যাদার বন্ধন ও লোক-নিন্দার পাশ। অনেকে সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াও এই বন্ধনের হাত এড়াইতে পারে না। মহর্ষি এ বন্ধনও ছেদন করিলেন। দ্বারকানাথের নাম কে না জানে? সেই দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধ। খুল্লতাত রমানাথ ঠাকুর পূর্ব্বাহ্নেই জানাইলেন, "ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া একটা গোল করিও না।" রাধাকান্তদেব পিঠ্ চাপ্ড়াইয়া কত বুঝাইলেন। দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ভাই গিরীন্দ্রনাথও শীতল জল ঢালিলেন, সকলে কতই লোক-নিন্দার ভয় দেখাইলেন, কিন্তু মহর্ষি অটল ভাবে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন, কোন বাধা গ্রাহ্য করিলেন না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, প্রথম অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইল। মহর্ষি বলিলেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরও গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আমি আর কিছুই চাহি না।"

তৃতীয়, ধনসম্পত্তির পাশ। 'কার ঠাকুর কোম্পানী'র বৃহৎ কারবার দেউলিয়া হইল। দ্বারকানাথ পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কতকগুলি সম্পত্তি "ট্রাষ্ট" করিয়া রাখিয়াছিলেন—যাহার উপর পাওনাদারদের কোনও দাবী ছিল না। মহর্ষি আইনের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া সকল সম্পত্তি পাওনাদারদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজার ছেলে স্বেচ্ছায় ফকীর হইলেন, ফকীরের অপেক্ষা বেশী কিছু হইলেন। রাজপুত্রের পক্ষে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ফকির হওয়া সহজ, সংসার পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সংসারে থাকিয়া সংসারের উপর জয়লাভ করা সহজ নহে। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র সংসারী রহিলেন, কিন্তু সংসারের সকল উপকরণ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু এই ত্যাগের মধ্যেও কিঞ্চিৎ অপূর্ব্বত্ব আছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগের সঙ্গে কষ্ট অনুভূত হয়, তাঁহারা কিছু ছাড়িলেন, এই জ্ঞান তাঁহাদের স্পষ্ট বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু মহর্ষির ত্যাগে কষ্ট হয় নাই, বরং আনন্দ। জীবন্ত বিষধরাক্রান্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, এ তেমনই আনন্দ। ত্যাগ করিয়া মহর্ষি গীতোক্ত শান্তি লাভ করিলেন—"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্"। এই সময়ের মনের ভাব তিনি নিজেই অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর এই এক দিন। আমি আর এক সোপান উঠিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।" প্রিন্স দ্বারকানাথ—যাঁহার এক এক ডিনারে ব্যয় হইত হাজার হাজার টাকা, তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র ডিনারে চারি আনার বেশী মূল্যের দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। "চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম—খাওয়া পরা নিয়মিত করিলাম, ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখও শান্তি তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম"।

চতুর্থ, শোক-পাশ। পুত্রশোকের মত শোক মানুষের আর নাই। পুত্রশোকে মানুষ আত্মহত্যা করে, পুত্রশোকে মানুষ পাগল হয়। এদেশে ব্রহ্মজ্ঞানীর পরীক্ষা পুত্রশোকে। রামমোহনকে এ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেটা জাল, মিথ্যা। মহর্ষিকে কিন্তু সত্য সত্যই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছে। পুত্র হেমেন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ আসিল, মহর্ষি পাইচারি করিতেছিলেন, ক্ষণেকের জন্য থামিলেন; তার পর শান্তভাবে সকল খবর লইলেন, সকল ব্যবস্থা করিলেন, মৃত্যু পরাস্ত হইল।

পঞ্চম, জরা-পাশ। মহর্ষি ইহলোকেই জরা-মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দিব্যধামবাসী হইয়াছিলেন। জরা তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় সকল বিনাশ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সে অবস্থাতেও তিনি যে তেজের সঙ্গে ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে সবল সুস্থকায় যুবকদিগকে লজ্জা পাইতে হইত। যিনি